সমান্তরাল

– অমিত আহসান

আমার এই কল্পকাহিনীর মুখ্য চরিত্রের নাম শান্তনু। বয়স চল্লিশের কোঠায়। পনেরো ষোল বছর হলো একটি মালটিন্যাশনালে কাজ করছে। একজন কাঠখোট্টা পেশাজীবী হলেও শিল্প, সাহিত্য এবং চলচ্চিত্রে তার আগ্রহ সেই ছোটবেলা থেকেই। ছাত্র জীবনে তার অধিকাংশ সময় কেটেছে কবি, সাহিত্যিক আর চলচ্চিত্রকার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিয়েই। যদিও নিজে কখনো শিল্প, সাহিত্য চর্চা করেনি কিংবা করার সাহস করেনি।

আজ সেই শান্তনু যায়যায়দিনের বিশেষ একটি সংখ্যা হাতে নিয়ে ভাবছিল নতুন লেখক তৈরিতে এই পত্রিকাটির অবদানের কথা। তার মনে পড়ে যে, এই পত্রিকাটি যখন প্রথম বের হলো আর খুবই দ্রুত পপুলার হলো তখনো সে অবাক হয়েছিল এর নামকরণের ব্যাপারে সম্পাদকের অসীম সাহসিকতা দেখে। এ ধরনের নাম দিতে অনেক সাহসের প্রয়োজন হয়। সে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লিখেছিল সম্পাদককে। আজ এই পত্রিকাটি আবারও সৎ সাহস এবং অভিনবত্বের ছাপ রেখেছে নতুন পাঠক ও নতুন লেখক তৈরিতে।

শান্তনুর মনে পড়ে যায় সেই আশির দশকের কথা। কি পাগলের মতো অপেক্ষা করতো সে প্রতিটি সংখ্যার জন্য। এক পর্যায়ে সে দুই কপি করে রাখতো। একটা নিজের, আরেকটা বাড়ির সকলের জন্য। শান্তনুর আরো মনে পড়ে যায় এর প্রতিটি সংখ্যা নিয়ে তার এক বন্ধুর সঙ্গে নিয়মিত টেলিফোন আলাপের কথা। মা কতোদিন বিরক্তি প্রকাশ করেছেন – হচ্ছেটা কি, এতো কথা কার সঙ্গে?

কেমন আছে সে? শান্তনু তার সেই বন্ধুটিকে মনে করতে চায়। কোথায় আছে সে আজ? কি করছে এখন? সামনের মাসেই তো তার জন্মদিন। ঠিকানাটা জানা থাকলে একটা কার্ড পাঠানো যেতো। আগে তো সে-ই নিয়ম করে কার্ড পাঠাতো। গত কয়েক বছর হলো কোনো খবরই নেই। বেমালুম ভুলে গেছে। এ কোন প্রবাসে হারিয়ে গেল তার অমৃতা?

শান্তনু ঠিক করলো যে, সে তার জীবনের এই অব্যক্ত অধ্যায়টি যায়যায়দিনে লিখবে। বসে গেল কমপিউটার নিয়ে। লেখা কি এতো সহজ? মনে মনে হাজার সালাম জানালো সে সফল লেখকদের। কিন্তু হাল ছাড়লো না। আজ তাকে লিখতেই হবে। তার বুকের ভেতর চেপে থাকা এই ভালোবাসার কথাগুলো সে বের করে আনবেই যা থাকে কপালে!

শান্তনু লেখা শুরু করে। বলা যায়, প্রায় এক নিঃশ্বাসেই সে লিখে ফেলে অনেকটা। মেয়েটির সঙ্গে তার পরিচয়, বন্ধুত্ব, ঘনিষ্ঠতা আর শেষে নিজের হিসাবের গড়মিলের কারণে সম্পর্কের বিয়োগান্ত সমাপ্তি। এগুলো লেখার সময় শান্তনু আবিষ্কার করে, কতোটা ভালোবাসা এতোকাল তার হৃদয়ের এক গোপন প্রকষ্ঠে গচ্ছিত আছে। ঠিক যেন গুপ্তধনের মতো। সে স্বভাবতই তখন জানতে চায়, অমৃতার হৃদয়ের কথা। সেটাও সে লেখে।

লেখা শেষ হলে শান্তনু ভাবে, আমার অমৃতা কি এখনো যায়যায়দিন পড়ে? লন্ডনে তো শুনেছি পত্রিকাটি নিয়মিত যায়। আমার এই অক্ষয় ভালোবাসার কথা জানতে পেরে অমৃতা খুশি হওয়ার চেয়ে পুরনো কাসুন্দি ঘেটে কি লাভ ভেবে হয়তো বিরক্তই হবে। নাহ! লেখাটা পাঠানো ঠিক হবে না।

কয়েকদিন এভাবেই গেল। শান্তনু একবার ভাবে লেখাটি পাঠাবে আবার ভাবে পাঠাবে না। তাছাড়া লেখাটি অন্যের চোখে পড়লে বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। ছদ্মনামে লিখলে কেমন হয়? যেমন চিন্তা তেমন কাজ। সে লেখাটি ছদ্মনামে পাঠিয়ে দিল তার প্রিয় পত্রিকায়। লেখাটির সঙ্গে শান্তনু ইচ্ছা করেই তার ছদ্মনামের ইমেইল অ্যাডড্রেসটি যোগ করে দিল লেখাটি যদি ভাগ্যক্রমে অমৃতার হাতে পড়ে এই দুরাশায়!

প্রবাসী পঞ্চম সংখ্যায় লেখাটি ছাপা হলো। জীবনের প্রথম নিজের লেখা ছাপার অক্ষরে দেখে খুব এক্সাইটেড হয় শান্তনু। বার বার সে পড়ে। কিন্তু কারো সঙ্গেই শেয়ার করতে পারে না তার এই এক্সাইটমেন্ট সঙ্গত কারণেই।

লেখাটি প্রকাশের দুই দিন পর থেকে শান্তনু অজস্র ই-মেইল পেতে থাকে দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। তার ভাবতেই ভালো লাগে যে তার মতো একজন অলেখকের লেখা এতো পাঠক পড়ছে এবং রিঅ্যাক্ট করছে। বাহ! আমি যে রীতিমতো একজন লেখক হয়ে গেলাম। থ্যাংক ইউ যাযাদি। শান্তনু মনে মনে বলে।

অধিকাংশ ই-মেইলের মূল বক্তব্য হচ্ছে যে, লেখাটি ভালো হয়েছে। তবে সবাই জানতে চেয়েছে যে, এটা কি নিছকই কল্পকাহিনী, না লেখকের নিজের কথা?

একজন পাঠিকা লিখেছেন, আপনি একটা অপদার্থ। এতো সুন্দর একটা সম্পর্ক ধরে রাখতে পারলেন না আর এখন প্রেম উথলে উঠছে ইত্যাদি।

আরেকজন লিখেছেন, এতোদিন পর আর পুরনো কাসুন্দি ঘাটা কেন? কি চান আপনি? বেচারি অমৃতাকে একটু শান্তিতে থাকতে দিন ইত্যাদি।

ক্যালিফোর্নিয়া থেকে একজন লিখলেন, লেট আস প্রে দ্যাট অল আওয়ার বিলাভেড ওয়ানস লিভ হ্যাপিলি এভার আফটার।

কথাটি শান্তনুর মনে দাগ কাটলো। চমৎকার কথা। আমরা যেন সবাই এ রকম প্রার্থনা করি।

লন্ডন থেকে প্রস্তাব এলো, আপনার অমৃতাকে খুজে দেবো, বিনিময়ে কি দেবেন জানাবেন।

মালয়শিয়া থেকে একজন প্রবাসী শ্রমিক লিখলেন, আপনার জন্য অনেক মায়া হয় ভাই। দোয়া করি, ভালো থাকবেন। আমার জন্যও দোয়া করবেন।

রাজশাহী থেকে এলো, এতো সুন্দর আর পবিত্র করে ভালোবাসতে পারেন আপনি! আপনার সঙ্গে আমার আগে দেখা হলো না কেন?

শান্তনু ভাবলো, বেশ মজা তো লেখকদের। আর ছদ্মনামের বদৌলতে বকুনিগুলো হজম করতেও সুবিধা হলো।

এ রকম বহু মেইল আসে। কিন্তু সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিতটা আসে না।

আরেকজন অনুরোধ করলো, লেখাটা মনে দাগ কাটার মতো। আরো লেখা চাই। তবে সেটার হতে হবে হ্যাপি এন্ডিং।

একদিন শান্তনু তার ইন বক্সে একটি নাম দেখে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না। সোহেলি আনাম। অমৃতার আসল নাম। বার বার সে দেখে। কিন্তু মেইলটি ওপেন করতে দ্বিধা করে। কি আছে এই মেইলে? অনেক ভেবে-চিন্তে শান্তনু মাউসে ক্লিক করে।

শান্তনু,

আমি জানি এটা তোমার লেখা। কেমন আছো তুমি? এতোদিন বাদে এতো সব লিখেছো কেন? ইচ্ছা করেই যোগাযোগ রাখিনি। আমি জানি, তুমিও আমায় ভালোবাসতে। তবে কেন সেই ভালোবাসার মর্যাদা তুমি সেদিন দাওনি সেটা জানবো কি করে? নিজের ভাগ্যকে মেনে নিয়ে সামনে এগিয়েছি। একটি মুহূর্তের জন্যও তোমাকে ভুলিনি। এতোটাই ভালোবেসেছিলাম যে, কখনোই তোমার ওপর রাগ হয়নি। যাকগে, তুমি অনেক অনেক ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।

তোমার অমৃতা।

পুনশ্চ : আমাদের মধ্যে যোগাযোগ না রাখাই ভালো। এই জটিল জীবনকে আর জটিলতর করতে চাই না।

শান্তনু নিজের অজান্তেই কমপিউটার স্ক্রনে অমৃতার ই-মেইলের ওপর আঙুল রাখে। সে অমৃতার স্পর্শ অনুভব করতে চায়। এতোকাল পরে পেয়েও হারানো। এ যে কি কষ্টের! সে মনে মনে বলে, ঠিক আছে, আমি আর কোনোদিন তোমার খোজ করবো না। তবুও তুমি ভালো থাকো জান। তোমার ভালোবাসা বুকে নিয়ে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারবো।

চেয়ারে হেলান দিয়ে কমপিউটার স্ক্রনে ভেসে থাকা *তোমার অমৃতা* শব্দ দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকে শান্তনু আর গুন গুন করে গায় –

দুই ভুবনে দুই বাসিন্দা, বন্ধু চিরকাল
রেললাইন বহে সমান্তরাল, বহে সমান্তরাল।

amit_ahsan2000@yahoo.com

জাহান্নামে

– সুপ্রাণ স্বাপ্নিক

আমি তো ভালোই ছিলাম। বন্ধু, আড্ডা, বিনোদন, পাঠাগার সবই শৃঙ্খল সুতোতে ছিল বাধা। কলেজ, লেখাপড়া সবই ছিল নিয়মের আবর্তে।

আকাশ, সে তো উদার।

জমিন, সে তো সবুজ।

প্রকৃতি, সে তো নয়নাভিরাম।

সবই ছিল আমার দৃষ্টির সীমানায়। তবে কখন, কোথায়, কেন নিয়ম শৃঙ্খলার সুতো ছিড়ে যায় আমার জীবনের লাটাই থেকে?

একটি মেয়ে। মেয়েটি খুবই রূপবতী। তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় যেদিন আমরা বাসা বদলিয়ে তাদেরই পাশের ফ্ল্যাটে আসি। আমাদের পরিবারের একমাত্র আমিই প্রথম রাত কাটাই এ নতুন বাসায়। আর বাকিরা তখনো পুরনো বাসায়ই আছে। বাসার আসবাবপত্র ইত্যাদি আংশিক আনা হয়েছে। মালপত্র আনার সময়েই তাকে প্রথম এক ঝলক দেখেছিলাম।

শুধু দখল শর্তে আমাকে একাই প্রথম রাতটি থাকতে হচ্ছে।

তাই ভালোবাসার পেখম ছড়িয়ে সারা বাসাময় আলোড়ন তুলে সঙ্গীত চর্চা শুরু করে দিলাম। একটু পর পর দেখি পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটি বারান্দায় এসেছে কি না। যদি দেখি বারান্দায় আসেনি তাহলে গানের কলি আওড়াতে শুরু করি।

হঠাৎ দরজা খোলা পেয়ে পাশের ফ্ল্যাটের মেয়ে যমের মতো ঢুকে পড়লো আমাদের খালি বাসায়। ব্যাপারটি তাৎক্ষণিকভাবে আমার কাছে স্বপ্ন মনে হলো।

কি নাম আপনার?

নাম দিয়ে কাজ নেই! আপনি পাগলের মতো এই খালি বাসায় প্রলাপ বকছেন কেন? আমার পড়ার ডিস্টার্ব হচ্ছে।

এই কয়টি শব্দ মুখের ওপর বলে দিয়েই মেয়েটি চলে যাচ্ছিল। আমি তখনো তার চলে যাওয়া দেখছিলাম পেছন থেকে।

মেয়েটি আবার পেছন ফিরে আমার দিকে তাকালো। আমার হৃদয় বৃক্ষের পাতা তখন কেপে উঠলো থরথরিয়ে... যাকে হৃদয় স্পন্দন বলা হয়।

এরপর ধীরে ধীরে আমার অন্তর্নিহিত ভালো লাগা ক্রমেই প্রকাশ পেতে থাকে।

এভাবে প্রতিদিনই মেয়েটির সঙ্গে চোখাচোখি হয় আমার। যতো দেখি ততোই যেন চুম্বকধর্মী কিছু একটা ঘটে যায়। তার চোখের রাজ্যে যেন পৃথিবীর সকল সুখ ভেসে বেড়ায়। আমি একে একে আসক্ত হয়ে যাই মেয়েটির গোলাপি রূপের কাছে।

মেয়েটিকে যে আমি বার বার দেখি, এতে তার কোনো বিরক্তি কিংবা বিমুখতা কখনো দেখিনি। তবে তার মনোভাব ছিল অস্ফুট। আমার একটা অন্ধ বিশ্বাস ছিল, মেয়েটি অন্তত আমার ভালোবাসার প্রস্তাব উপেক্ষা করবে না।

এভাবেই গড়িয়ে যাচ্ছিল দিন, ক্ষণ, সময়। একদিন মর্নিং ওয়াকে বের হয়ে দিব্যি পেয়ে যাই মেয়েটিকে। পার্কের ইট বাধানো রাস্তা ধরে খুব সম্ভব সে যাচ্ছিল প্রাইভেট পড়তে। আমি পথ আগলে আবেগ আপ্লুত হয়ে বলেই ফেললাম, আপনাকে আমার প্রচণ্ড ভালো লাগে। ভালোবাসি পাগলের মতো! প্লিজ, বলুন না কি নাম আপনার?

মেয়েটি ঠোট কামড়িয়ে জানিয়ে দিল, তার নাম তুলি।

আমার চোখের ঘুম, নাওয়া-খাওয়া সব কিছু হারাম! কেবল স্বপ্নের পেছনে, তুলির পেছনেই ছুটে চলা!

একদিন প্রবল আবেগে তুলির হাত ছুতেই সে বললো, না, হাত ছোবেন না।

বললাম, গোলাপ নাও, স্পর্শ নাও।

তুলি সাফ সাফ বলে দিল, নেবো না গোলাপের পরশ।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম আমি। নিজের অস্তিত্ব ভুলে প্রবল আবেগে জড়িয়ে ধরলাম তুলিকে। বললাম, তোমাকে ছাড়া আমি বাচবো না।

তুলি তখন তার দ্বিতীয় রূপের খোলস ছাড়লো। আমাকে এক ঝটকায় ঠেলে দিয়ে দৌড়ে চলে গেল। বিচার দিল তার মায়ের কাছে। তার মা অগ্নিশর্মা হয়ে এসেই আমাকে পেয়ে গেল সামনের বারান্দায়। রক্ত চোখ শাসিয়ে ইচ্ছা মতো বকাঝকা করে ছাড়লেন তিনি।

তুলির আড়ালে যে এই নিষ্ঠুরতা কালো মেঘ লুকিয়ে ছিল তা কখনো বুঝিনি। সূর্যের আড়ালেও যে মেঘ থাকে তা বুঝলাম এই প্রথম।

আঘাত ও অপমানে মুখ ঢাকলাম। বাসায় ঢুকতেই দেখি আমার জননী দাড়িয়ে আছেন দরজায়। সব কিছু তিনি পেছনে দাড়িয়ে শুনেছেন।

আমি দ্বিতীয়বার বাসায় ঢোকার চেষ্টা করতেই মা বাধা দিলেন, তোর মতো ছেলের দরকার নেই। কোথায় যাবি যা।

যাবো কোথায় মা। আমি যে বড়ই ক্লান্ত, অসহায়।

জাহান্নামে যা।

সেই থেকে আমি জাহান্নামেই আছি।

শ্রীমঙ্গল, সিলেট থেকে

অনুপ্রবেশ

– শেমুর

নাহ! হচ্ছে না। নিজের ওপর প্রচণ্ড বিরক্তিতে ভ্রূ দুটো কোচকালো সবুজ। কোনোভাবেই মেয়েটাকে পটাতে পারছি না?

এমন তো কখনো হয়নি তার? যখনই কোনো মেয়ে তার নজরে পড়েছে, সামান্য চেষ্টাতেই তাদের পটিয়ে ফেলতে পেরেছে। অথচ সোনিয়ার ক্ষেত্রে প্রায় এক মাসের চেষ্টা তার কখনো ফলবতী হলো না।

একটা দুই মাস মেয়াদী কোর্সে সিংগাপুর এসেছে সবুজ। উঠেছে বিখ্যাত এক হোটেলে। সতেরোটা দেশের চৌত্রিশ প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে সবুজ একাই বাংলাদেশি। তার স্মার্ট আচার-ব্যবহারে ইতিমধ্যেই প্রশিক্ষণার্থী সব মেয়ে তার ভক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু গোল বেধেছে এই সোনিয়াকে নিয়ে।

সোনিয়া বাইজাকোভা। মধ্য এশিয়ার তুর্কমেনিস্তান প্রজাতন্ত্রের অনিন্দ সুন্দর কমনীয়তা, রমণীয়তায় ভরা এই পূর্ণ যৌবনা। প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের বৃলিয়ান্ট সংমিশ্রণ। মাত্র পচিশ বছর বয়সেই সরকারের মাঝারি গোছের কর্মকর্তা। চাকরির সুবাদেই শিখেছে সুন্দর করে কিভাবে না বলতে হয়। যে কোনো পুরুষেরই সে স্বপ্ন। অথচ খুব সুন্দর করেই সবাইকে প্রত্যাখ্যান করছে সে। এবং সবার সামনেই চ্যালেঞ্জ করেছে সবুজ, সোনিয়াকে রাজি করাবেই।

গতকাল স্কুল থেকে ফেরার পথে বাসে সোনিয়ার পাশে বসার সুযোগ পেয়েছিল সবুজ। এক ঘণ্টা গল্পে চমৎকার কাটালো তারা। এক সময় সোনিয়া এতো প্রগলভ আচরণ করছিল যে, আশান্বিত হয়ে একবার আস্তে করে হাতের ওপর হাত রেখেছিল সোনিয়ার।

সঙ্গে সঙ্গে বরফের মতো ঠাণ্ডা স্বরে সোনিয়া বলেছিল, প্লিজ বিহেভ। Please behave.

বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মতো হাত সরিয়ে নিয়েছে সবুজ। রুমে এসে গজ রাচ্ছিল সে। সতীপনা! হুহ!

রাতটা নির্ঘুম গেল সবুজের। প্ল্যান করতে করতেই শেষ হলো রাতটা। কোনো প্ল্যানই সাকসেসফুলি সোনিয়াকে পটিয়ে ফেলার মতো সাউন্ড মনে হলো না। প্রচণ্ড অবসাদ, নিজের ওপর বিরক্তি আর মাথা ধরা নিয়ে সকালে বিছানা ছাড়লো সে। ক্যাফেটারিয়ায় নাশতার টেবিলে গিয়ে সোনিয়াকে পেল সতেজ, সদ্যস্নাতা যেন জুই ফুলটি!

ইউ লুক সো টায়ার্ড। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো সোনিয়া। রাতে ঘুম হয়নি নাকি? চোখ লাল? মদ-টদ তো খাও না যে বলবো হ্যাংগওভার কাটেনি। হোয়াট হ্যাপেনড টু ইউ?

মনে মনে রেগে উঠলেও মুখে কষ্টের হাসি ফোটালো সবুজ। এ এত্তো দরদি! তো রাজি হও না কেন? মুখে বললো, নাহ, কাল রাতে তো ভালোই ঘুমিয়েছি। স্বপ্ন দেখেছি তোমাকে। একটু আদর করতে গেলাম। অমনি তুমি বললে, প্লিজ, বিহেভ। ঘুমটা ভেঙে গেল তৎক্ষণাৎ। হাসলো সবুজ আবারও। দেখো, তোমার *প্লিজ বিহেভ* ভুলতে পাচ্ছি না স্বপ্নেও।

পুরো এক মিনিট সবুজের চোখে চোখ রাখলো সোনিয়া। একটু অবাক হয়েছে যেন। তারপর শুরু করলো হাসি। কাফের সবগুলো গ্লাস যেন কাবার্ড থেকে আছড়ে পড়ে ভাঙছে এমন খিল খিল হাসি। হাসতে হাসতে চোখে পানি আসে তার। আহ! তুমি দেখি হার্ট (Hurt) হয়েছো। তোমাকে হার্ট করার জন্য ও কথা বলিনি। বাট আই ফিল, আই হার্ট ইউ। হাউ ক্যান আই কমপেনসেট? ইজ সরি এনাফ?

নো, নট এনাফ। ব্যগ্রভাবে জবাব দিল সবুজ। ইট উইল বি মিনিমাইজড ইফ ইউ একসেপট মাই প্রপোজাল টু ভিজিট দি জু টুডে উইথ মি। উইল ইউ?

উমম! একসেপটেড। স্মিত মুখে রাজি হলো কন্যা।

হুররে! সবুজের আনন্দ ধ্বনিকে সচকিত কাফের সবাই।

দি লেডি হ্যাজ একসেপটেড। ব্যাখ্যা করলো সবুজ সকলকে উৎফুল্ল গলায়।

সারা দিনই চিড়িয়াখানায় ঘুরলো তারা। পিঠের হিচহাইকিং ব্যাগ থেকে ক্ষণে ক্ষণে ক্যান্ডি, চকলেট আর কোল্ড ড্রিংকসের ক্যান বের করে সবুজ কৃতজ্ঞ করলো সোনিয়াকে। ধীরে ধীরে এগোতে হবে। নিজেকে সাবধান করলো সবুজ। আজ যেন মিস নো-কে মিস ইয়েস-এ চেঞ্জ করতে পারি। দৃঢ় সংকল্প হলো সবুজ।

খুব রেয়ার প্রজাতির একটা বাঘের সামনে তারা। আমাদের জাতীয় পশু। ব্যাখ্যা করলো সবুজ।

দাড়াও, তোমাদের জাতীয় পশুর সঙ্গে তোমার ছবি তুলি। ক্যামেরা বের করে বললো সোনিয়া।

ছবি তোলা শেষ হলে আবদার ধরলো সোনিয়া, ছবি তুলবে ব্যাঘ্ররাজের সঙ্গে সেও। বাঘের দিকে পেছন ফিরে হাসি মুখে প্রস্তুত সোনিয়া, প্রস্তুব সবুজও।

ক্লিক করার আগ মুহূর্তে, কি সৌভাগ্য সবুজের, মাটিতে নাক ঠেকিয়ে বুক ভরে দম নিয়ে গর্জে উঠলো বাঘ। আর ভয়ে উড়ন্ত মিসাইলের মতো সোনিয়া আছড়ে পড়লো সবুজের বুকে। এরই মধ্যে শাটার টিপে দিয়েছে সবুজ। তারপর আস্তে করে জড়িয়ে ধরলো সোনিয়াকে। পিঠে মৃদু চাপড় দিয়ে সাহস জোগাচ্ছে থর থর করে কাপতে থাকা সোনিয়াকে।

বাঘের ডাক সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না তার। নরম স্তনের নিচে সোনিয়ার বুকটা কাপছে। কাপছে সবুজও অন্য জ্বালায়। আস্তে করে চিবুকটা উচিয়ে ঠোটটা নামিয়ে আনলো সোনিয়ার ঠোটে। গোলাপের পাপড়ির মতো তির তির করে কাপছিল তাও। সাড়া দিল সোনিয়াও।

কতোক্ষণ তারা এভাবে ছিল জানে না। সংবিৎ ফিরলো চারপাশে ভিড় করে দাড়িয়ে থাকা উৎসুক দর্শকের শরম মন্তব্যে – দ্যাখছনি, একদম গ্লু লাগাইয়া দিছে মালুম হয়। এই যে, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন, ১০০ হাত দূরে থাকুন।

নানান জাতীয় মন্তব্যে লজ্জা পেল তারা।

চলো, ভাগি এখান থেকে। মৃদু কণ্ঠে বললো সোনিয়া। আজ সন্ধ্যায় তুমি কি ফৃ? জানতে চাইলো সোনিয়া। তোমার জন্য ফৃ আমি, সন্ধ্যা রাত কিংবা সকালে। উৎফুল্ল জবাব সবুজের নিজের ওপর পূর্ণ আস্থায়।

ঢাকা থেকে

সন্দেহ

– শায়লা

পেছন থেকে কে যেন তনু তনু বলে চিৎকার করে উঠলো। চমকে উঠলাম। কারণ আমার নাম তন্বী। আর তনু বলে ডাকে একমাত্র রাতুল। পেছন ফিরে দেখলাম রাতুলের সঙ্গে খুব সুন্দর একটা মেয়ে। নিশ্চয় লোপা। শুনেছি লোপা তার নতুন প্রেমিকা। অবশ্য বিশ্বাস করিনি। কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে পড়ে গেলাম। মনে হচ্ছে চোরাবালিতে ডুবে যাচ্ছি।

হঠাৎ রাতুলের স্পর্শে ঘোর ভেঙে গেল। রাতুল কেমন যেন বিদ্রূপের হাসি দিয়ে বললো, ও হচ্ছে লোপা। বলেই লোপার একটা হাত ধরলো। নির্বিকার মুখে সে আবার বললো, যাবে কফি হাউসে? এক সঙ্গে গল্প করবো।

বললাম, নাহ! তোমারই যাও, গল্প করো।

লোপা বললো, আসি।

বাসায় এসে নিজের রুমে ঢুকে কিছুক্ষণ থ মেরে বসে রইলাম। কাদতে চেষ্টা করছি। কিন্তু পারছি না। বুকে মনে হচ্ছে একটা পাথর চেপে আছে। তীব্র কষ্ট হচ্ছে। বিশ্বাস করতে পারছি না, রাতুল সত্যি সত্যিই প্রেম করছে। তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ হয়েছে মাত্র দুই মাস তেরো দিন আগে। এরই মধ্যে সে আরেকজনের সঙ্গে...!

সে আমার চেয়ে তিন বছরের বড়। একই ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি। তার–আমার সম্পর্ক প্রায় চার বছরের। ইউনিভার্সিটির প্রায় সবাই জানে আমাদের সম্পর্কের কথা। এতোদিনের সম্পর্ক রাতুল শুধু একটা সন্দেহের কারণে ভেঙে দিল?

সন্দেহটা মাহতাবকে নিয়ে।

মাহতাব আমার শৈশব থেকে শুরু করে সব সময়ের বন্ধু। রাতুল যে মাহতাব আর আমাকে নিয়ে নেগেটিভ কিছু ভাবছে তা প্রথমে বুঝতেই পারিনি।

হঠাৎ একদিন রাতুল এসে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি গতকাল মাহতাবের সঙ্গে রিকশায় কোথায় গিয়েছিলে?
আইসকৃম খেতে গিয়েছি শুনে বললো, আমার সঙ্গে কি আইসকৃম খেতে যাওয়া যায় না? আমার বন্ধুরা তোমাদের নিয়ে বাজে কথা বলে। সন্দেহ করে তোমাকে নিয়ে। এটা আমি সহ্য করতে পারি না।
জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি সন্দেহ করো না?
সে চুপ করে রইলো।
তুমি এবং তোমার ওই তথাকথিত বন্ধুদের ভিত্তিহীন সন্দেহের কারণে মাহতাবের সঙ্গে বন্ধুত্ব আমি ছাড়তে পারবো না। বলে দৌড়ে বাসায় চলে এলাম।
এরপর বেশ কয়েকদিন ধরে তার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। এ কয়টা দিন যে আমি কি পরিমাণ মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে কাটিয়েছি সেটা একমাত্র মাহতাবই জানে। সে-ই আমাকে আগলে রেখেছিল। রাতুলের সন্দেহের ব্যাপারে আচ করতে পেরে মাহতাব চেয়েছিল রাতুলের ভুল ভাঙাতে। কিন্তু আমি তা করতে দিইনি। রাতুল যে এতো বড় একটা সন্দেহ নিয়েও অবলীলায় এতোদিন আমার হাত ধরতো ভাবতেই ঘেন্না লাগছিল। মাহতাব আমার এতো ভালো বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও কি করে সে এসব ভাবলো? রাতুলের সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ার আগে সব বড় বড় সিদ্ধান্ত মাহতাবের সঙ্গে আলোচনা করেই নিয়েছি। এমনকি রাতুলের সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল মাহতাবের। রাতুল সেটা ভালোভাবেই জানে। সেই মাহতাবকে নিয়ে রাতুলের এ সন্দেহ? ছিঃ!
একদিন রাতুল ফোন করে বললো, সম্পর্কের ব্যাপারে কি ঠিক করলে? কে থাকবে? আমি, নাকি মাহতাব?
বললাম, মাহতাবকে ছাড়লেও তোমার সন্দেহ কোনোদিন দূর হবে না। তাছাড়া তাকেও আমি ছাড়তে পারবো না।
ঠিক আছে, মাহতাবের সঙ্গেই থাকো। বলে ফোন রেখে দিল।
সে ফোন রেখে দেয়ার পর খেয়াল করলাম, রাগে আমি কাপছি।
কলিংবেলের শব্দ শুনে বুঝলাম মাহতাব এসেছে। সে বলে আজ কি সব জরুরি কথা বলবে।
বাসা থেকে এক সঙ্গে বের হয়ে রিকশা নিলাম। দুজনেই চুপচাপ।
কিছুক্ষণ পর সে বললো,
এখন কি করবে বলে ঠিক করেছো?
বললাম, কি আর করবো! নতুন প্রেমের সন্ধান করছি।
ফাজলামি করো না। ঠিক করে বলো কি সিদ্ধান্ত নিলে?
দেখো, তার সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়েছে বলে আমি সুইসাইড করবো না। আমি এ ধরনের মেয়েও না। তবে হ্যা, তার ঘটনাটা আজীবন আমার জীবনের শাদা পৃষ্ঠায় বল পয়েন্ট কলমের কালো দাগ হয়ে থাকবে।
মাহতাব বললো, আমার দুই হাত দিয়ে সারা জীবন তোমাকে যদি আমি ধরে রাখতে চাই তাহলে তুমি দেবে?
একটু হেসে বললাম, আমি জানতাম, একদিন তুমি এ ধরনের কথা বলবে। সব বন্ধুই তাই করে। দেখো, আমার আর রাতুলের সম্পর্ক ভাঙার মাঝে তুমি যদি না থাকতে তাহলে তোমাকে নিয়ে হয়তো বা আমি অন্য কিছু চিন্তা-ভাবনা করতাম। কিন্তু এখন আমি অন্য কিছু চিন্তা করতে পারবো না। কারণ রাতুলের সন্দেহটাকে সত্যি প্রমাণ করতে চাই না। প্লিজ, তুমি কি রিকশা থেকে নেমে যাবে? আমি একটু একা ঘুরবো।
মাহতাব কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, প্লিজ।
রিকশার হুড ফেলে দিয়ে একা ঘুরতে যে, এতো মজা আগে বুঝতে পারিনি।
আকাশে ঘন ছাই মেঘ।
ভীষণ কান্না পাচ্ছিল।

হে আল্লাহ! প্লিজ, বৃষ্টি দাও।
আল্লাহ আমার প্রার্থনা শুনলো।
ঝুম করে বৃষ্টি নেমে গেল। আর আমার চোখ দিয়েও বৃষ্টি শুরু হলো।

সবুজবাগ, চট্টগ্রাম থেকে

টাইটানিকের বাস্তব প্রেমকাহিনী

– শরীফুল হক

টাইটানিকের কথা পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে আছে। নন্দিত পরিচালক জেমস ক্যামেরন–এর এই বিগ বাজেট সিনেমা বেশ ভালোভাবেই কাপিয়েছিল বিশ্বের তাবৎ সিনে দর্শকদের। প্রেমিক–প্রেমিকাদের কথা তো বলাই বাহুল্য। কেননা টাইটানিকের ডেকে রেলিংয়ের ওপর দাড়ানো জ্যাক আর রোজ–এর সেই রোমান্টিক দৃশ্য তারা ভুলতে পারেননি। টাইটানিক সিনেমার গুণে প্রেম–ভালোবাসা, বিরহ আর রোজ–জ্যাক এখন সমার্থক।

কিন্তু কেউ কি কখনো কল্পনা করেছেন যে, রোজ–জ্যাকের সেই অমর প্রেম শুধু পর্দায় নয়, বাস্তবেও ঘটেছিল। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, তাদের মতো এমন একটি জুটি খুজে পাওয়া গেছে। খুটিনাটি অমিল ছাড়া তাদের কাহিনী একেবারেই টাইটানিক সিনেমার মতো। বাস্তবের রোজ ছিলেন একজন সাধারণ পরিচারিকা। রবার্টা মায়নি নামের এই তরুণী স্কটিশ কাউন্টেস লুসি রথস–এর সঙ্গে সাউদাম্পটন থেকে উত্তর আমেরিকার উদ্দেশ্যে টাইটানিকের প্রথম আর শেষ যাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন। মায়নির বয়স তখন মাত্র একুশ। প্রথম শ্রেণীর যাত্রী হিসেবে ভ্রমণকালে যাত্রার প্রথম দিনেই মায়নির সঙ্গে পরিচয় ঘটে এক তরুণ স্টুয়ার্ডের যা ধীরে ধীরে রূপ নেয় ভালোবাসায়। যদিও মায়নি কোনোদিন তার প্রেমিকের নাম প্রকাশ করেননি।

টাইটানিক ডুবি থেকে উদ্ধারের পর পরবর্তী জীবনে মায়নি প্রায়ই তার সেই প্রেমের গল্প পরিবারের সদস্যদের কাছে তুলে ধরতেন। অল্প সময়ের পরিচয় হলেও মায়নি পাগলের মতো ভালোবেসে ফেলেছিলেন ওই স্টুয়ার্ডকে। টাইটানিক ট্র্যাজেডি থেকে মায়নি বেচে গেলেও তার সেই প্রেমিক জ্যাকের মতোই হারিয়ে গিয়েছিলেন সমুদ্রের হিম শীতল পানিতে। কিন্তু তাদের সেই প্রেম হারিয়ে যায়নি। বৃটেনের উইল্টশায়ার অকশন হাউসে সেই স্টুয়ার্ডের দেয়া একটি উপহার আর হারিয়ে যাওয়া প্রেমের ওপর মায়নির লেখা একটি কবিতা নিলামে ওঠার ঘোষণার পর তাদের প্রেমের কাহিনী প্রকাশ পেয়ে যায়। দুর্ঘটনার চোদ্দ বছর পর মায়নির স্মৃতিচারণমূলক সাত পৃষ্ঠার একটি লেখাও নিলামে উঠেছিল।

মায়নির লেখা সেই কবিতাকে বিশেষজ্ঞরা চিহ্নিত করেছেন টাইটানিক ডুবির অপূর্ব চিত্রায়ণ হিসেবে। লিখিত বিবরণটিও ইতিমধ্যেই প্রত্যক্ষদর্শী রচনার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। মায়নির লেখায় ভালোবাসার স্মৃতি আর পুরো ঘটনার বর্ণনা ফুটে উঠেছে একেবারে জীবন্তভাবে। এর সঙ্গে টাইটানিক সিনেমার কাহিনীর তেমন কোনো পার্থক্য নেই। আইসবার্গের সঙ্গে টাইটানিকের সংঘর্ষের পর পরই সেই তরুণ স্টুয়ার্ট খুজে বের করেন মায়নিকে। তার বর্ণনায়, *ভয়ংকর সংঘর্ষের পর আমি ঘুম থেকে জেগে যাই। চারদিকে তখন ধাতব শব্দ, পানির তীব্র আওয়াজ এবং যাত্রীদের ভয়ার্ত চিৎকার শোনা যাচ্ছিল।*

এমন অবস্থায় সেই তরুণ এসে মায়নিকে জানান যে, টাইটানিক আইসবার্গের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে। তিনি মায়নিকে আশ্বস্ত করেন, মনে হয় না কোনো বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে। তবে তেমন কিছু যদি হয় তাহলে আমি ফিরে এসে তোমাকে জানাবো।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সে ফিরে এসে মায়নিকে তৈরি হয়ে নিতে বলে। তারপর পথ দেখিয়ে তাকে নিয়ে আসেন জাহাজের ডেকে। কিন্তু তখনো তিনি পুরো বিপদ আচ করতে পারেননি। তাই তিনি ওই অবস্থায় স্টুয়ার্টের পরনের লাইফজ্যাকেট নিয়ে বিদ্রূপ করছিলেন। কিন্তু তরুণটি যখন এসবের কোনো উত্তর না দিয়ে বিষণ্ণ

দৃষ্টিতে তার দিকে তাকানোর পর মায়নি বুঝে নেন, কোনো বড় বিপদ ঘটেছে। ডেক জুড়ে পড়ে থাকা বরফের চাই আর আতংকিত যাত্রীদের জটলা তার ভয় আরো বাড়িয়ে দেয়।

মায়নির বর্ণনায়, কিছু লোক তখনো বেশ শান্তভাবেই কথাবার্তা বলছিল। কারণ তারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতো যে, পানিরোধক কম্পার্টমেন্ট টাইটানিককে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু আর বাকি সবাই আতংকিত কিংবা ঘটনার ভয়াবহতায় হতবাক হয়ে গিয়েছিল। আসন্ন মৃত্যুর বিভীষিকা তাদের গ্রাস করে নিচ্ছিল।

বেশ কৌতুকের সঙ্গে মায়নি লিখেছেন, পুরুষদের প্রায় সবাই তখন বিধ্বস্ত। তাদের মধ্যে কয়েকজন আবার প্রার্থনাও করছিলেন। যদিও আমি নিশ্চিত, এ কাজটি তারা আগে কখনোই করেননি। এই বর্ণনার সঙ্গে টাইটানিক সিনেমাতে প্রার্থনার দৃশ্যটি হুবহু মিলে যায়।

মায়নিকে নিজের হাতেই লাইফবোটে তুলে দেন তরুণটি। শেষ বিদায়ের আগের মুহূর্তে সে তার ভালোবাসার শেষ চিহ্ন হিসেবে মায়নির হাতে তুলে দেয় তারা আকৃতির নিজের টাইটানিক অফিশিয়াল ব্যাজ। তফাত শুধু এটুকুই যে, সিনেমাতে রোজের হাতে জ্যাক তুলে দিয়েছিল নীল রত্নখচিত নেকলেস। ডুবে যাওয়ার আগে টাইটানিকের প্রতিটি ফ্লোর ছিল আলোকিত। কিন্তু যখন বয়লার বিস্ফোরিত হতে শুরু করে তখন চোদ্দশ নারী–পুরুষ ও শিশুদের আর্তচিৎকারে জাহাজের পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে।

মায়নি যখন লাইফবোটে ভাসছিলেন তখন হঠাৎ এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। এক মুহূর্তের আলোকিত আকাশে মায়নি দেখেন বিশাল আইসবার্গটিকে যার কাছে টাইটানিককে খেলার মতো মনে হচ্ছিল।

আতংক আর উত্তেজনার মধ্য দিয়ে মায়নি সমুদ্রে টাইটানিককে দ্রুত ডুবে যেতে দেখেন। এরপর নেমে আসে এমন এক স্তব্ধতা যা আগের চিৎকারের আওয়াজের চেয়েও ভয়াবহ। ঢেউ না থাকায় লাইফবোটগুলো ছিল নিরাপদ। তবে চারদিকের পানিতে ছড়িয়ে–ছিটিয়ে ছিল ধ্বংসাবশেষ এবং মৃতদেহ। পরদিন মায়নির আট নাম্বার লাইফবোটটিকে উদ্ধার করে *কার্পেথিয়া* জাহাজ। সেখানেই মায়নি তার পকেট থেকে বের করে আনেন সেই ব্যাজটি। যা তিনি বাকি জীবন গলায় পরতেন। ভালোবাসার চিহ্ন হিসেবে এরপর মনিব লুসির সঙ্গেই নিউ ইয়র্ক চলে আসেন মায়নি। সেখানকার প্লাজা হোটেলে পৌছার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তিনি টাইটানিককে নিয়ে কবিতাটি লেখেন। নিউ ইয়র্ক থেকে বৃটেনে ফিরে মায়নি বিয়ে করেন ইয়র্কশায়ারের ধনী ব্যবসায়ী কানলিফ বোলান্ড–কে। তবে তাদের কোনো সন্তান না থাকায় মায়নির মৃত্যুর পর মায়নির যাবতীয় সম্পত্তি লাভ করে তার আত্মীয়স্বজনরা।

টাইটানিকের শেষ যাত্রাতেই প্রেমের সূচনা হয়েছিল সিনেমার রোজ রূপী কেট উইনস্লেট আর বাস্তবের রবার্টা মায়নি। করুণ ট্র্যাজেডি কেড়ে নিয়েছে রোজের প্রেমিক জ্যাক রূপী লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও আর মায়নির সেই তরুণ স্টুয়ার্ডকে। তবে তাদের মধ্যে যা রয়ে গেছে তা হলো *ভালোবাসা।* রোজ যেমন তার স্মৃতি হিসেবে পেয়েছিল একটি নেকলেস তেমনি মায়নিও পেয়েছিলেন সাধারণ কিন্তু অসামান্য টাইটানিক ব্যাজ। বোধহয় তাদের জন্যই *ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন* প্রবাদটির জন্ম যেমন কল্পনাকেও হার মানায় বাস্তব জীবনের প্রেমিক–প্রেমিকারা।

গাজীপুর থেকে

চেকমেট

– জেফ্‌ আর্চার

মেয়েটি ঘরে ঢোকা মাত্রই সকলের চোখ সেদিকে আটকে গেল। ছেলেরা সাধারণত মেয়েদের দেখে উপর থেকে নিচে। আর আমি দেখি নিচ থেকে উপরে। তাই প্রথমেই আমার চোখে পড়লো কালো ভেলভেটের হাইহিল জুতা। চমৎকার সুগঠিত একজোড়া পা। হাটুর উপরে টাইট কালো ড্রেস। সরু কোমর আর দারুণ

স্লিম ফিগার। সবশেষে দেখলাম তার চেহারা। দেখে চোখ ফেরাতে পারলাম না। ডিম্বাকৃতি মুখে সামান্য ফোলা ঠোট। ডাগর নীল চোখ, ছোট করে ছাটা এক মাথা ঝলমলে কালো চুল।

কূটনৈতিক সংবর্ধনা ককটেল পার্টি বা ফর্মাল ডিনারে এমন অপ্সরীদের দেখা মেলে। তাই বলে দাবা টুর্নামেন্টে...!

আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি যে, সেও আমাদের মতো খেলতে এসেছে কি না। পরে দেখলাম সে ক্লাব সেক্রেটারির কাছে নাম সই করে খেলার জন্য টোকেন নিচ্ছে। টেবিলে খেলোয়াড়েরা বোর্ড পেতে বসেছে। যাদের প্রতিপক্ষ এখনো ঠিক হয়নি তারা উদগ্রীব হয়ে উঠলো মেয়েটির সঙ্গে খেলার জন্য।

কিন্তু সকলের আশায় ছাই দিয়ে তার খেলা পড়লো আমাদের ক্লাবের বুড়ো সাবেক ক্যাপটেনের সঙ্গে।

এ বছরে আমাদের ক্লাবের নতুন ক্যাপেটন হিসেবে আমি এই রাউন্ড রবিন লীগটা আয়োজন করেছিলাম। প্রতি মাসের শেষ শুক্রবারে আমরা একটা পানশালার দোতলার হলরুমে দাবা খেলতে বসি। পানশালার মালিকের দায়িত্ব হচ্ছে, ত্রিশটা টেবিলের ব্যবস্থা করা এবং পর্যাপ্ত খাবার ও পানীয় মওজুদ রাখা। আমাদের জেলার আরো তিন চারটা ক্লাব থেকেও ছয় সাতজন খেলোয়াড় আমাদের এখানে খেলতে আসে।

খেলার নিয়ম–কানুন খুবই সরল। এক মিনিটের মধ্যে প্রতিটা চাল দিতে হবে। ত্রিশ মিনিটের মধ্যে কেউ কোনো ঘুটি না খেতে পারলে খেলা ড্র। মোটামুটি এক ঘণ্টার মধ্যে প্রথম রাউন্ড শেষ হয়ে যায়। তারপর ছোট একটা বিরতির পর শুরু হয় দ্বিতীয় রাউন্ড।

আমিও এতোক্ষণ প্রতিপক্ষের অপেক্ষা করছিলাম। অবশেষে চশমা পরা, থ্রি পিস সুট গায়ে হালকা–পাতলা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার খেলা পড়লো। আমি ভেবেছিলাম ভদ্রলোক উকিল। পরে শুনলাম তিনি একটা স্টেশনারি প্রতিষ্ঠানের একাউন্টেন্ট।

খেলা শুরু হলো। কিন্তু আমার মন আর চোখ দুটোই পড়ে রইলো সেই মেয়েটার দিকে। একবার চোখাচোখি হওয়াতে সে মৃদু হাসলো। এরপর তাকিয়ে থাকা সত্ত্বেও সে আর আমার দিকে তাকালো না। এদিকে আমার প্রতিপক্ষ এতোই কাচা যে, অমনোযোগী অবস্থায়ও তাকে হারিয়ে দিলাম।

হাফ টাইমের সময় তার সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে দেখি, আমার আগেই কয়েকজন তাকে ছেকে ধরেছে।

দ্বিতীয় রাউন্ডেও তার সঙ্গে আমার খেলার সৌভাগ্য হলো না। স্বাগতিক ক্যাপটেন হিসেবে আমি অন্য একটা ক্লাবের অতিথি ক্যাপেটেনের সঙ্গে খেলতে বসলাম। এক ফাকে দেখলাম মেয়েটি এবারে সেই একাউন্টেন্ট লোকটির সঙ্গে খেলছে।

দ্বিতীয় রাউন্ডেও আমি চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই জিতে গেলাম। তারপর টেবিল ছেড়ে উঠে অন্যদের দেখাশোনা করার ছুতোয় মেয়েটির টেবিলের কাছে গিয়ে হাজির হলাম। সেখানেও একটু পরেই খেলা শেষ। একাউন্টেন্ট ভদ্রলোক মেয়েটিকে হারিয়ে দিয়েছেন।

এবারে আমার ভাগ্য খুললো। মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হলো। হ্যান্ডশেক করতে গিয়ে তার হাত ছুয়ে আমি শিহরিত হলাম। অবশেষে তাকে নিয়ে বারে বসলাম। সে নিল রেড ওয়াইন, আমি বিয়ার।

মেয়েটির নাম আমান্ডা কার্জন। দাবা নিয়ে টুকটাক আলাপ করার পর সে হঠাৎ করে বললো, এবার আমাকে উঠতে হবে। হাউনস্লো যাবার শেষ ট্রেনটা মিস হয়ে যাবে।

না, না একটু বসুন। আমি আপনাকে পৌছে দেবো। আমি তাড়াতাড়ি বললাম।

কিন্তু আপনার জন্য দূর হয়ে যাবে না? সে মৃদু আপত্তি করলো।

মোটেই না। আমি বললাম। যদিও হাউনস্লো আমার বাড়ি ছাড়িয়ে আরো কুড়ি মিনিটের পথ।

ঝটপট আমার বিয়ারটা শেষ করে পানশালার মালিককে ধন্যবাদ জানিয়ে আমান্ডা–কে নিয়ে আমার গাড়িতে উঠে বসলাম।

সে প্যাসেঞ্জার সিটে আরাম করে বসলো। তার সংক্ষিপ্ত ড্রেসটা ততোক্ষণে হাটুর বেশ উপরে উঠে গিয়েছে।

কিছুক্ষণ ড্রাইভ করার পর বললাম, এখনো বেশি রাত হয়নি। বাড়ি যাবার পথে আমার ফ্ল্যাটে একটু ঘুরে যাবেন?

সে ঘড়ি দেখে বললো, যেতে পারি। কিন্তু অল্পক্ষণের জন্য। কালকে অফিস আছে।

তাই নাকি? আপনি কোন অফিসে আছেন?

আমি বার্কলে স্কোয়ারে একটা অফিসের রিসেপশনিস্ট।

তাই নাকি। আমি ভেবেছিলাম আপনি মডেল।

ছিলাম এক সময়। বলেই সে অন্য প্রসঙ্গে কথা বলতে শুরু করলো।

ততোক্ষণে আমরা ফ্ল্যাটে এসে গেছি। আমান্ডাকে আমার ড্রয়িংরুমে নিয়ে এসে তার হাত থেকে কোটটা র‍্যাকে ঝুলিয়ে দিলাম।

আপনি কি নেবেন? তাকে ড্রিংকস অফার করলাম।

এক গ্লাস ওয়াইন দিন যদি থাকে।

ওয়াইন নিয়ে এসে দেখি সে আমার ফ্ল্যাটটা ঘুরে দেখছে। ভাগ্য ভালো, ঘর-দোর মোটামুটি গোছানোই ছিল। বোঝেনই তো, ব্যাচেলরের আস্তানা। আমি বললাম *ব্যাচেলর* কথাটার ওপর জোর দিয়ে।

আমান্ডার ততোক্ষণে চোখে পড়েছে মেক্সিকো থেকে আনা আমার হাতির দাতের দাবার ছকটা। বোর্ডে ঘুটি সাজানো। আমি একজনের সঙ্গে চিঠির মাধ্যমে একটা খেলা খেলছিলাম।

বাহ কি সুন্দর! সে প্রশংসা করলো।

হয়ে যাবে নাকি এক গেম? আমি অফার করলাম।

আমান্ডা আবার ঘড়ি দেখলো।

ঠিক আছে। তবে তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে।

কিছু বাজি ধরবো নাকি? আমি হালকাভাবে বললাম।

সে তার পার্স দেখলো। আমার কাছে বেশি টাকা নেই।

টাকা-পয়সার কথা নয়। আমি অন্য জিনিসের কথা বলছিলাম।

তার মানে?

আমি হারলে আপনাকে দশ পাউন্ড দেবো। আপনি হারলে একটা কাপড় খুলে ফেলবেন।

কথাটা বলেই বুঝলাম দারুণ বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। মেয়েটা এবার চড় কষিয়ে দেয় কি না কে জানে।

কিন্তু সে স্বাভাবিকভাবেই বললো, মাত্র একটা গেম খেললে বেশি কিছু খুলতে হবে না।

খেলতে বসে বুঝলাম আমান্ডা একেবারে মাঝারি মাপের খেলোয়াড়। তাকে কয়েকটা ঘুটি খাবার সুযোগ দিয়ে কুড়ি মিনিটের মাথায় হারিয়ে দিলাম। আমি যেই বললাম চেকমেট, সে তার জুড়ো জোড়া খুলে ফেলে হেসে উঠলো।

আরেক গ্লাস হবে নাকি? বলে আমি ওয়াইনের বোতলটা নিয়ে এলাম।

আধা গ্লাস, বেশি নয়। সে বললো।

ঠিক আছে। চলুন আরেকটা গেম হোক।

সে ইতস্তত করতে লাগলো।

এবারে বাজি ডাবল। হারলে আমি কুড়ি পাউন্ড দেবো। আপনি হারলে একটাই কাপড় খুলবেন।

আমান্ডা অবশেষে রাজি হলো। ইতিমধ্যে আমি তার গ্লাসে আরো ওয়াইন ঢেলেছি, সে খেয়াল করেনি।

দ্বিতীয় গেমের শুরুতে বোকার মতো একটা চাল দিয়ে কিছুটা পিছিয়ে পড়লেও অবশেষে আমিই জিতলাম।

এবার আমান্ডা আমার দিকে তাকিয়ে একটু রহস্যময় হাসি হাসলো। তারপর ধীরে ধীরে তার ড্রেসটা উপরে তুললো। এবং তার পাতলা লম্বা মোজা জোড়া খুলে টেবিলের ওপর রাখলো।

আমি এবার প্রায় আপনাকে হারিয়ে দিচ্ছিলাম। সে বললো।

তাতো বটেই। আমি অনেক কষ্ট করে জিতেছি। আমি ঝটপট তার কথায় সায় দিলাম। এক কাজ করুন, আরেকটা গেম খেলে দেখুন আমাকে হারিয়ে দিতে পারেন কি না। এবারে পঞ্চাশ পাউন্ড বাজি।

বাজি তো দেখছি বেড়েই চলেছে। সে হেসে বললো।

এবারের গেমটাতেও আমি সহজেই জিতে গেলাম। আমান্ডার খেলায় কোনো বুদ্ধির ছাপ নেই।

আমি এবার আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম সে কি খুলে দেয় দেখার জন্য। সে তার ড্রেসটা কোমরের উপর তুলে ফেললো। তারপর কালো রঙের সাসপেন্ডার বেল্টটা খুলে ফেলে দিল।

বোকার মতো আমার নৌকাগুলো কাটা না পড়লে আমি এই গেমটাতে হারতাম না। সে আফসোস করে বললো।

একদম ঠিক। এ জন্যই আপনার আরেকটা গেম খেলা উচিত। এবারে একশ পাউন্ড বাজি। আমি বললাম।

সে হেসে ফেললো। কিন্তু এটাই শেষ। এরপর আমাকে বাড়ি যেতেই হবে।

এবারের গেমটা সে অনেক ভালো খেললো। এমনকি দুই একবার মনে হচ্ছিল, সে আমাকে হারিয়েও দিতে পারে। কিন্তু কারপভের মতো সিসিলিয়ান ডিফেন্স খেলে জিতে গেলাম।

চেকমেট।

যাহ!। এবারও হলো না। দেখি উঠুন, আমাকে একটু সাহায্য করতে হবে। বলে সে উঠে আমার দিকে পেছন ফিরে দাড়ালো।

আমি উঠে দাড়িয়ে কাপা হাতে তার ড্রেসের জিপ টেনে নামিয়ে দিলাম। আমার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল তার নরম–মসৃণ শরীরটা একটু ছুয়ে দেখতে। কিন্তু তার আগেই সে ঘুরে দাড়ালো এবং তার ড্রেসটা খুলে ফেললো।

মনে হলো যেন কোনো শ্বেত পাথরের ভাস্কর্য উন্মোচিত হলো। ঝুকে পড়ে সে আলতো করে আমার গালটা ছুয়ে দিল। উত্তেজনায় আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হলো।

আমান্ডার শরীরে এখন শুধু অর্ধ স্বচ্ছ লেসের কালো ব্রা আর প্যান্টি!

আমি রুদ্ধশ্বাসে এই সন্ধ্যার অনিবার্য পরিণতির অপেক্ষা করছি।

আর মাত্র একটা গেম। আমি অনুরোধ করলাম। এবং তার ওয়াইনের গ্লাসে আরো ওয়াইন ঢেলে দিলাম।

না। আর নয়। এবার আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো।

না, আরেকটা গেম, প্লিজ। বেশ এবারে দুইশ পাউন্ড বাজি। আর হেরে গেলে তুমি দুটোই খুলে দেবে। আমি অনুরোধ করলাম।

কখনো না। বলেই সে খিল খিল করে হেসে উঠলো।

গ্লাসের পর গ্লাস ওয়াইন খেয়ে সে তখন বেসামাল। অন্যদিকে আমি সেই প্রথম গ্লাসের পর আর মদ ছুইনি।

আমি বুঝিয়ে–শুনিয়ে তাকে শেষ গেমটা খেলতে রাজি করালাম। খেলা শুরু হলো। আমি রানীর সামনের সৈন্যটা এক ঘর এগিয়ে দিলাম। সে রাজার সামনের সৈন্যটা দুই ঘর এগিয়ে দিল। এর পাল্টা চাল আমার জানাই ছিল। আমি নিশ্চিত মনে চালটা দিয়ে দিলাম। এবং মাত্র এগারো মিনিটের মাথায় খেলা শেষ হয়ে গেল।

আমার এতো বছরের খেলোয়াড়ি জীবনে এমন গোহারা কখনো হারিনি। খেলোয়াড় হিসেবে আমান্ডার পায়ের নখের যোগ্যও আমি নই। সেটা সে আমাকে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিল। যে কৌশলে সে খেললো, যেসব চাল দিল তা খেলতে জানা দূরের কথা, আমি কোনোদিন দেখিনি, শুনিনিও।

ঠোটে সেই রহস্যময় হাসি নিয়ে সে বললো, চেকমেট।
হতবাক হয়ে কতোক্ষণ বসে ছিলাম জানি না। এক পর্যায়ে খেয়াল করলাম সে জামা–কাপড় পরে ফেলেছে। শুধু তাই নয়, সে ঘরে ঢুকে আমার ছকটা যেভাবে দেখেছিল ঠিক সে অবস্থায় সেটাকে সাজিয়ে ফেলেছে।
কিছুটা সামলে উঠে তার নামে ২০০ পাউন্ডের চেক লিখলাম।
সে স্বাভাবিকভাবে আমার হাত থেকে চেকটা নিয়ে গালে আলতো করে একটা চুমু দিল। থ্যাংক ইউ। আমরা আরেকদিন খেলতে বসবো, কেমন? এ কথা আমাকে বলে সে দ্রুত দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল।
দাড়াও, দাড়াও। তুমি এতো রাতে বাড়ি যাবে কিভাবে? বলে আমি তার পেছনে ছুটলাম।
আমার খামোখা ব্যস্ত হওয়ার দরকার ছিল না। দেখলাম আমার বাড়ির সামনের রাস্তায় একটা দামি বিএমডাবলিউ গাড়ি নিয়ে আমান্ডার জন্য অপেক্ষা করছে আমার সন্ধ্যাবেলার খেলার সঙ্গী সেই একাউন্টেন্ট।

ভাষান্তর : এস. রহমান

ভালোবাসা ইউনিভার্সিটি

– ফায়সাল

আমি বিশ্বাস করি এ পৃথিবীতে প্রায় সব মানুষই চায় বিশেষ কাউকে না কাউকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতে। তেমনি পেতে চায় আরেকজনের হৃদয়ের উষ্ণ ভালোবাসা। বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে আমার আজকের এই লেখা যাযাদির ওই সকল পাঠকদের জন্য যারা সত্যিকারভাবে একটি সুন্দর সম্পর্ক চান। কারণ আমি বিশ্বাস করি সকল মানুষেরই এটা প্রাপ্য।
প্রথমেই একটা কথা সকলের বোঝা উচিত। সেটা হচ্ছে, আমরা খুব অল্প সময়ের জন্য এই সুন্দর জীবনটা পাই। তাই আপনারা কেউ যদি এখন কারো সঙ্গে কোনো সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন আর যদি দেখেন সেই সম্পর্ক কোনো কিছুতে রূপ নিচ্ছে না তাহলে দয়া করে সময় নিয়ে একটু ভেবে দেখুন যে, আপনি কি করছেন। আপনার প্রতি আপনার সঙ্গীর আকর্ষণ যদি আপনার সমমানের না হয়, সে যদি আপনাকে ভালোবাসার সুউচ্চ বেদিতে স্থান না দিয়ে তার অলস সময়টা কাটানোর জন্য একজন নির্ভরযোগ্য সঙ্গী হিসেবে আপনাকে বেছে নেয় তাহলে বন্ধু, আপনার ভেবে দেখার সময় হয়েছে। আপনি কেন আগাছা নিয়ে খুশি থাকবেন, যখন আপনি সম্পূর্ণ বাগানেরই মালিক হতে পারেন আপনি কেন পান্তা ভাত দিয়ে লাঞ্চ সারবেন যখন আপনি বিরিয়ানি খেতে পারেন! ওই রকম আনরিলায়েবল সঙ্গীর জন্য অপেক্ষা করার পক্ষে জীবনটা অনেক ছোট। অপেক্ষার খেলা ছেড়ে দিন এবং আপনার স্বপ্নের ভালোবাসা ও কাঙ্ক্ষিত জীবন সঙ্গীর খোজে কাজ শুরু করে দিন। একটা কথা সব সময় মনে রাখবেন, You always deserve to be loved.
প্রথমেই নিজের সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস বাড়ান। আপনার সত্যিকার মনের মানুষটিকে পেতে হলে আপনাকে নিজের ব্যাপারে সৎ হতে হবে। মনে রাখবেন, কেউ আপনাকে পছন্দ করলে অবশ্যই আপনার ভেতরকার মানুষটি দেখেই পছন্দ করবে। এটা কোনো ব্যাপার না যে কোনো ধরনের ব্যক্তিত্বের অধিকারী আপনি, আপনার ব্যক্তিত্ব যে ধরনেরই হোক, এটা একান্তই আপনার। তাই এটা নিয়েই গর্ব করুন। আরেকজনের জন্য নিজেকে পরিবর্তন করবেন না। মনে রাখবেন, প্রত্যেক পটের যেমন তার নিজস্ব ঢাকনা থাকে তেমনি প্রত্যেক মানুষের জন্য রয়েছে তার সত্যিকার Compatible সঙ্গী। বিশেষ আরেকজনকে নকল করে তার মতো হতে গেলেই বিপত্তি দেখা দিতে পারে। কারণ কেউ হয়তো আপনার নকল ভাবভঙ্গী দেখে আপনার প্রতি আকৃষ্ট হলো। কিন্তু ভেবে দেখুন সে সত্যিকারে আপনাকে পছন্দ করেনি, করেছে নকল ভাবভঙ্গীসহ আপনাকে। তাই Be yourself.
আমরা এই পৃথিবীতে কেউই পারফেক্ট নয়। নিজেকে ভালোবাসুন বেশি বেশি করে আরেকজনকে ভালোবাসার আগে। কখনো নিজের আর্থিক, পারিবারিক অথবা শারীরিক ব্যাপার নিয়ে নিজেকে ছোট ভাববেন না অথবা

অন্যের কাছে এই নিয়ে দুঃখ করবেন না। মনে রাখবেন, একজন মানুষ হিসেবে আপনি সত্যিকারভাবেই ইউনিক বা অসাধারণ। স্রষ্টা আপনার মতো অন্য কাউকে সৃষ্টি করেনি, পৃথিবীতে আপনার মতো অন্য কেউ নেই এবং কেউ আসবেও না। এবার আসুন আলাপ করি কিভাবে পছন্দের মানুষটিকে সহজে এপ্রোচ করা যায়।

আপনার কি কখনো এমন হয়েছে যে, কোনো রেস্টুরেন্ট, কলেজ, ফাস্ট ফুড শপ অথবা সামাজিক অনুষ্ঠানে কাউকে দেখলেন যার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার জন্য বা সামান্য একটু কথা বলার জন্য আপনার মন ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। কিন্তু আপনি নিজ থেকে প্রথম এগিয়ে যেতে ভয় পাচ্ছেন? আপনি একা নন। সত্যিকার কথা হচ্ছে, আমরা অনেকেই লজ্জা পাই ঘর ভর্তি মানুষের সামনে একদম অপরিচিত কারো সঙ্গে কথা বলতে। অনেকেই নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় বা কথা বলাটাকে অনেক কঠিন কাজ বলে মনে করেন। ব্যাপারটা সত্যিকারভাবে ততোটা কঠিন নয় যদি আপনি জানেন কিভাবে নতুন মানুষটাকে এপ্রোচ করতে হয়।

মনে রাখবেন, আপনি প্রথমবারের মতো যখন কারো সঙ্গে নিজ থেকে পরিচিত হতে যাচ্ছেন, আপনি সেই মানুষটাকে অনেক বড় ফেভার করছেন। ভাবুন তো কেউ যদি আপনার সঙ্গে কোনো পার্টিতে আগবাড়িয়ে পরিচিত হতে এলো তাহলে কেমন লাগবে আপনার? নিশ্চয়ই খুব ভালো অনুভব করবেন নিজের মনের ভেতরে। আরেকটা ব্যাপারে অনেকটা শান্তি অনুভব করবেন যে, আপনাকে প্রথম এগিয়ে যেতে হলো না। তাই নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয়টাকে বেশি কঠিন করে তুলবেন না, যতোটা এটা নয়। যদিও আপনি মনের মতো কাউকে খুজছেন। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, ভান করুন! হ্যা, নিজে নিজে মনে করুন যে, পৃথিবীর সব আত্মবিশ্বাস আপনার মধ্যে আছে। সেটাই সবচেয়ে সহজ পথ।

এবার আসল কথায় আসি। কোথাও যদি আকর্ষণীয় কাউকে আপনার মনে ধরে তাহলে স্রষ্টার দেয়া মহামূল্যবান চোখটাকে ব্যবহার করুন। পছন্দের মানুষটির চোখে চোখ রাখুন অন্তত দশ থেকে পনেরো সেকেন্ড। তাকে বুঝতে দিন আপনি ইচ্ছা করেই এমনটা করেছেন। তারপর দৃষ্টি সরিয়ে ফেলুন। আবার তাকান তার চোখের দিকে। তারপর একটা চমৎকার হাসি দিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিন। আপনি একজন সুখী, বন্ধু সুলভ এবং আত্মবিশ্বাসী মানুষ। মনে রাখবেন, আপনার দৃষ্টিতে যেন কোনো যৌন ইচ্ছা প্রকাশ না পায়। যদি আপনি আপনার হাসির উত্তরে হাসি অথবা কোনো পজিটিভ সিগনাল পান তাহলে আগে বা পরে তার সঙ্গে নিজেকে পরিচিত করুন। ওজনে ভারী কোনো টপিক নিয়ে আলাপ করবেন না। হালকা আলাপচারিতা করুন। যদি আলাপের পরে সে কোনো ইন্টারেস্ট না দেখায় তাহলেও আপনার হারানোর কিছু নেই। আজ থেকে মনে করুন No শব্দটির অর্থ সব সময় *না* নয়। আজ থেকে মনে করুন, No হচ্ছে Next Option. একজন না হলে অন্যজন আপনার প্রতি অনুরক্ত হবে।

আলাপচারিতা জমিয়ে রাখাও একটা দক্ষতার ব্যাপার। আলাপচারিতা চমৎকার ছন্দে রাখার ভালো উপায় হচ্ছে, অপরপক্ষকে সুন্দর কমপ্লিমেন্টস দেয়া। আর সে আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবে না যদি না আপনি চমৎকার অ্যাপিলিং কিছু দিয়ে শুরু করতে না পারেন। কাউকে কমপ্লিমেন্টস দেয়ার আগে নিজের কল্পনা শক্তিকে ব্যবহার করুন। এবং অবশ্যই স্পেসিফিক থাকুন। যেমন যদি কোনো মেয়ের সুন্দর শাড়ি সম্পর্কে তাকে বলেন, চমৎকার সুন্দর শাড়ি, সুন্দর মানিয়েছে আপনাকে। এটা বলে অবশ্যই আপনি তার মনটাকে খুশিতে ভরিয়ে দিলেন এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনি যদি আরো এক ধাপ এগিয়ে তাকে বলতে পারেন, চমৎকার সুন্দর শাড়ি, শাড়িটার সুন্দর রং আর ফেব্রিক্স আপনার গায়ের রংয়ের সঙ্গে চমৎকার মানিয়েছে, কোথেকে কিনলেন? এই মন্তব্য অবশ্যই তার মনে ভালো প্রভাব ফেলবে এবং আলাপচারিতা এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

আরেকটা ভালো উপায় হচ্ছে মজাদার কোনো গল্প বলা। গল্প বলা আলাপচারিতাকে হালকা রাখতে এবং দুই পক্ষের নতুন পরিচয়ের বরফ গলতে সাহায্য করে। তবে মনে রাখবেন, গল্পটা যেন মজাদার কোনো গল্প হয়। এমন কোনো কিছু বলবেন না যাতে খারাপ ইমপ্রেশন হতে পারে আপনার প্রতি।

আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, পুরো আলাপচারিতাকে ওয়ান ম্যান শো হিসেবে পরিণত করবেন না, অপরপক্ষকেও বলতে দিন। একজন ভালো শ্রোতা হতে চেষ্টা করুন। খুব কম মানুষই ভালো শ্রোতা। সম্পূর্ণ রিলেশনশিপটাই অনেক বিশাল একটা ব্যাপার।

নিউ ইয়র্ক থেকে
ameet27@hotmail.com

ব্যর্থ কল্পনা

– ইঞ্জিনিয়ার রফিকুল ইসলাম

তার বাড়ি থেকে কলেজ দূরে ছিল বলে সে ঢাকাতে তার ভাইয়ের বাসায় চলে গেল পড়াশোনা করতে। ঢাকার এক নাম করা মহিলা কলেজে ভর্তি হলো। ভাবলাম ভালোই হলো, গ্রামে তার সঙ্গে পরিচিতজনদের ভয়ে ভালো করে কথাই বলতে পারতাম না, ঢাকাতে গিয়ে এবার চুটিয়ে প্রেম করা যাবো। রমনা পার্ক, সোহরওয়ার্দী উদ্যানে হাত ধরে ঘুরতে পারবো। বেশ খুশি হলাম তার ঢাকা ভর্তি হওয়াতে। তার ভাইয়ের বাসা থেকে কলেজটা একটু দূরে হওয়াতে সে তার ভাইয়ের শ্বশুরবাড়ি থেকে ক্লাস করতে লাগলো।

বেশ কিছুদিন ডিপ্লোমার পরীক্ষার পড়াশোনা এবং টাকা–পয়সার টানাটানিতে ঢাকা যাওয়া হয়ে উঠলো না। বিভিন্নভাবে খবর নিলাম। সবাই বললো, তার নাকি অনেক পরিবর্তন হয়েছে। গ্রামের মেয়ে বলে মনেই হবে না। কথায় কথায় ইংরেজি বলে। তার ভাইয়ের শালাদের সঙ্গে মাঝে মধ্যে সিনেমাও যায়। আমি ছিলাম গ্রামের নিতান্তই শাদামাটা টাইপের ছেলে। ভালোভাবে বাংলাই বলতে পারতাম না। কিন্তু তার ভাইয়ের শালারা ছিল ভীষণ স্মার্ট। কথায় ইংরেজির ফুলঝুরি, সব সময় আমেরিকা যাবার গল্প, সেখানেই সেটলড হওয়ার ইচ্ছা... ইত্যাদি। এসব রঙিন স্বপ্নে সম্ভবত তার চোখও কিছুটা ঝাপসা হয়ে থাকবে।

ডিপ্লোমার ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হলো। হস্টেলের খাবারের টাকা থেকে বেশ কষ্ট করে কিছু টাকাও জমলো হাতে। একদিন এক বুক ভালোবাসা নিয়ে ঢাকা গেলাম। জমানো টাকার প্রায় অর্ধেক খরচ করে তার জন্য বেশ কিছু উপহার কিনলাম। সঙ্গে একটা ও লেখা লকেটসহ চেইনও কিনলাম। শীতের এক শিশির ভেজা সকালে ভালোবাসার ঢালা সাজিয়ে তার কলেজের গেটে গিয়ে দাড়ালাম।

কতো মেয়ে আসে। কিন্তু আমার প্রাণের মানুষটির দেখা নেই। বেশ কিছুক্ষণ পর দেখলাম দূরে তার রিকশা। দৌড়ে গেলাম রিকশার কাছে। সে আমাকে দেখলো। তবে রিকশা থামালো না। ভাবলাম হয়তো সে আমাকে চিনতে পারেনি।

নাম ধরে ডাকলাম।

সামান্য ঘাড় ফিরিয়ে দেখে রিকশাকে যেতে বললো।

হঠাৎ বিদ্যুতের শক খাওয়ার মতো রাস্তার মাঝখানেই দাড়িয়ে পড়লাম। দেখলাম আমার প্রিয়তমার রিকশা আমাকে আস্তে আস্তে ক্রস করে কলেজের গেটে গিয়ে থামলো। সে একবারও পেছনে না তাকিয়ে গট গট করে কলেজের মধ্যে প্রবেশ করলো।

ঢাকা আসার সময় কতো কিছু কল্পনা করেছিলাম। এতোদিন পরে সে আমাকে দেখে নিশ্চয়ই দৌড়ে এসে জড়ায়ে ধরবে,অথবা আমাকে দেখেই তার সেই চিরস্বভাব মতো কেদে ফেলবে এবং কৃত্রিম রাগের ভাব দেখিয়ে বলবে, এতোদিন পরে এলে...! তুমি আসলেই একটা বদমাশ। অথচ এই দুষ্ট লোকটাকে আমি ভালোবাসি।

হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। চোখে এক সঙ্গে অনেক জোনাকি পোকার আলো দেখতে লাগলাম। জ্ঞান হারাতে হারাতে সামলে নিয়ে ফুটপাথের ওপর বসে পড়লাম। বুকটার সেই ঝিনঝিন শব্দের ব্যথাটা ভীষণভাবে অনুভব করলাম। বুক ধরে বসেছিলাম কতোক্ষণ জানি না। হঠাৎ দেখলাম তার জন্য কেনা উপহারগুলোর ওপর টপ টপ করে বৃষ্টির ফোটার মতো অশ্রু ঝরছে। ভিজে গেল আমার অনেক কষ্টের হস্টেলের প্রতিদিনের খাবারের খরচের টাকা থেকে তিলে তিলে জমানো টাকায় আমার অতি প্রিয়জনের জন্য কেনা উপহারগুলো। আমারই চোখের লোনা জলে।

সউদি আরব থেকে

ভীত

– খন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান

সাম্প্রতিক কালে অনেক প্রেমের কাহিনী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনকে খুবই আলোচিত এবং আলোড়িত করেছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, তাদের প্রেমঘটিত অথবা শারীরিক সব ঘটনায় তারা খুব একটা ধিকৃত বা তিরস্কৃত হয়েছেন কিংবা সামাজিক জীবনে কোনো বড় ধরনের সমস্যায় পড়েছেন বলেও জানা যায় না, বরং অনেক ক্ষেত্রে তারা কখনো হয়েছেন বিখ্যাত, কখনো ঈর্ষণীয়। এ রকম কয়েকটি অসাধারণ ব্যক্তির প্রেম কাহিনীর সঙ্গে সাধারণের অবস্থানগত তুলনা করা যেতে পারে। যেমন :

ডায়ানার প্রেম, ডাইনির প্রেম : পৃন্সের ডায়ানার বিয়েপূর্ব প্রণয় সংক্রান্ত কোনো কাহিনী প্রসার লাভ করেনি। পৃন্স চার্লস–এর সঙ্গে পরিণয় সাপেক্ষে ডায়ানার যখন আন্তর্জাতিকীকরণ হয় তখন তিনি বিখ্যাত হলেন। বিয়ে বিচ্ছেদের পর ডায়ানার প্রেমিক ডোডি আল ফায়েদ–এর সঙ্গে গাড়ির মধ্যে সহমরণ তাকে যেন সারা বিশ্বে আরো মহিমান্বিত করে তুললো। বৃটেনসহ পৃথিবীর অনেক দেশের মানুষ মর্মাহত হলো। এখনো তার প্রতি অনেক মানুষ সহানুভূতিশীল। এ নিয়ে অনেক রসালো রিপোর্টিং মিডিয়াতে পাওয়া যায় যার বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে থাকে ডায়ানার ব্যক্তিগত জীবনের রহস্যময় পদচারণার কথা। এমন কথাও প্রচারিত যে, ডায়ানা নাকি মৃত্যুকালে গর্ভবতী ছিলেন।

আসলে সমাজের যে স্তরে আমার বা আমাদের অবস্থান সেখানে প্রেমিকা ডায়ানা অভিহিত হবেন এক নাম্বার ডাইনি আর ডোডি আল ফায়েদ হবেন দুই নাম্বার ফাজিল রূপে। অথচ পৃন্সেস ডায়ানা এখনো অনেক আধুনিক নারীর অনুকরণীয় মডেল। ডোডি আল–ফায়েদ হয়ে গেলেন যেন বিশ্বখ্যাত কোনো উপন্যাসের ট্র্যাজিক হিরো।

ক্লিন্টনীয় আনক্লিন প্রেম : আমেরিকান মুল্লুকের জনপ্রিয় সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ক্ষমতাসীন অবস্থায় তার অধীনস্থ এক স্থূলাঙ্গী তরুণীর প্রেমে পড়েছিলেন। বিবাহিত এই প্রেসিডেন্টের পরনারীতে প্রণয় যখন চলমান ছিল তখন বলতে গেলে কেউই জানতো না। কিভাবে কি হয়ে গেল! মনিকা লুইনস্কি নামের ওই তরুণী হঠাৎ করেই মুখ খুললেন। রাষ্ট্রপতি মি. ক্লিনটন প্রথমত. এক কথায় সব কিছু অস্বীকার করলেন। পরবর্তীকালে পরিস্থিতির মুখে *ওরাল সেক্স* হয়েছে বলে স্বীকারোক্তি দিলেন। ক্লিনটন–এর এই ওরাল সেক্স কি, সে ব্যাপারে সাধারণ মানুষের অনেকেই ধারণা লাভ করলো। মনিকা হয়ে গেলেন রাতারাতি বিখ্যাত। মিডিয়ায় তার একটি ইন্টারভিউ–এর দাম এখন অনেক (... ছোয়ায় যেন স্টার হয়ে যায়)!

ক্লিনটন এই ঘটনায় তার দেশে মোটামুটি ক্লিন থাকতে পারলেও এমন ঘটনা আমাদের মতো সাধারণের জীবনে প্রকাশিত হলে যে কেউ সারা জীবন সমাজে আনক্লিন (নোংরা) হিসেবে অভিহিত হতেন। আর আনক্লিন–টোন (কটূক্তি) শুনতে হতো জীবনভর।

এরশাদীয় প্রেম, শারদীয় রূপ : আমাদের দেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের ক্ষমতাসীন অবস্থায় নাকি অনেক বান্ধবী ছিল। এসব বান্ধবীদের কেউ কেউ রাধাও হয়েছেন। নারীদের প্রতি কোমল

আচরণের কারণেই নাকি বান্ধবীরা তার প্রতি আকৃষ্ট হতেন। বিশদ বিবরণে না গিয়ে বলা যায়, বৃদ্ধ বয়সে, বিধি-বিধানের তোয়াক্কা না করে তিনি দিশাহীন হয়ে বিদিশার পাণি গ্রহণ করে যে চমক দেখিয়েছেন, তা জাতির কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। রাজা-বাদশারা নাকি এ রকম একটু-আধটু করেই থাকেন।

মজার ব্যাপার হলো, মি. এরশাদ শারদীয় শুভ্রতা নিয়ে আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে অন্য দলের নেতানেত্রীদের আন্দোলনে ঐক্য করেন, এক মঞ্চে বসেন, বক্তৃতা দেন, ঐক্য ভাঙেন আবার ঐক্য গড়েন। তাতে দেশের রাজনীতি কলুষিত হয় না। আন্দোলন ও নেতানেত্রীদের মান অটুট থাকে।

ব্যক্তিগত জীবনের এ রকম ঘটনায় সাধারণের অবস্থান সমাজের কোথায় হতো!

'ক'- এর কাম এবং কামনা : হাল আমালের ক অক্ষরটি স্বাধীন যৌনবাদী লেখিকা তসলিমা নাসরিনের কল্যাণে বিশিষ্টতা লাভ করেছে। ক-এর মধ্যে কোনো কোনো প্রেম পিয়াসি পুরুষ হয়েছেন কাঙ্ক্ষিত আবার কেউ কলঙ্কিত। তসলিমার এই গোলমেলে প্রেমে দেখা যায়, তিনি পুরুষহীন একাকীত্বের যন্ত্রণা সইতে পারেন না, একই সঙ্গে প্রচণ্ড পুরুষ বিদ্বেষী। তিনি কোন খিরাজ-খোর পুরুষকে ইচ্ছামতো ভোগ করেছেন। কখনো ব্যক্তি বিশেষ চাইলেই শয্যাগত হয়েছেন। নিজ বাসায় মা-বোনের সামনে পরপুরুষ নিয়ে দরজা বন্ধ করে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে সবার সামনে এলোমেলো হয়ে রুম থেকে বের হচ্ছেন। পক্ষান্তরে কেউ দীর্ঘ দিনের বন্ধুত্বের সুবাদে এবং সীমাহীন উপকার করে প্রেম প্রার্থী হলেও হয়েছেন তাৎক্ষণিক বহিষ্কৃত ও ধিকৃত।

একজন সব্যসাচী লেখক সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন *খেলারাম এলেন বুঝি হাটি হাটি পা পা করে শরিফার বিছানার কাছে।* তাকে নিয়ে প্রমোদ বিহারে গিয়ে তেমন কোনো সুযোগ গ্রহণ না করেও অভিহিত হয়েছেন *মাতাল, লম্পট।* অথবা লেখিকার ভাইয়ের জবানীতে *মেয়ে মানুষ লইয়া ফূর্তি করার ওস্তাদ হকু। লুইচ্চা।* যদিও বর্ণিত *খেলারাম* অন্তত তার সঙ্গে তেমন কিছুই *খেলেননি।* এই লেখিকার সুবাদে অনেক পাঠক-পাঠিকা *অরগাজম* শব্দটির সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছেন। অরগাজম বিষয়টি তার অন্য একটি বইয়েও পাওয়া যায়। অরগাজম প্রত্যাশী এই নারীকে শতকরা একশভাগ গ্যারান্টি দিয়ে তৎকালে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন তার ফাসির দাবিদার কেউ কেউ।

এ রকম অরগাজম পিয়াসি পরনারীকে অরগাজমের স্বাদ দেয়া আমাদের মতো সাধারণের সাধ্যের বাইরে। অরগাজমের চ্যালেঞ্জ তো দূরের কথা, প্রকাশ্যে পরনারীতে বদনজর বদনসিব ডেকে আনবে সঙ্গে সঙ্গে। পক্ষান্তরে তসলিমা কিন্তু ওই সব *ক* মার্কা কাহিনী পুজি করেই আজকে ফেমাস রাইটারদের একজন।

অথচ সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে কতো কিছুই আকু পাকু করে! মনে হয় ডোডির মতো সহমরণেও সুখ আছে যদি সঙ্গে কোনো ডায়ানা থাকে। আমার মন *কোনো মনিকার সঙ্গে ওরাল সেক্স*-এর জন্য উতলা হয়। মনে হয় যদি এমন ক্ষমতাধর ও সুন্দর চেহারার হতাম তাহলে সখীর কোন অভাব হতো না। যেন দিশাহীন হতে কোনো ভয় নেই। আবার ভাবি, ক-এর যদি এমন কোনো চরিত্র হতাম যেখানে *লুইচ্চা হকু* না হয়ে মিলন হতাম কোনো বিদেশ ভ্রমণে! আসলে মানুষের মন বড় ঈর্ষা পরায়ণ। কেন বাপু, ওই সব ঐতিহাসিক বড় বড় ঘটনায় নিজেকে জড়ানো যা সবাই জেনে যাবে! এ জীবনে কতো ঘটনাই তো আছে। তা নিয়ে ভুলেও কখনো কারো সামনে মুখ খুলি না। মানহীন ঘটনাগুলো প্রকাশিত হলে যদি মানসম্মান চলে যায়!

আমার চল্লিশ বছর বয়সের কমপক্ষে কুড়িটা ঘটনা লেখা যায়। কিন্তু নিজের মানসম্মান খোয়াতে চাই না বলে সব ঘটনা চেপে থাকার পাশাপাশি ভয়ে ভয়ে থাকি যদি কখনো ফেসে যাই! দুঃসাহসিক কাজ কোনোদিন আমাকে দিয়ে হয় না। নিজের কথা প্রকাশের সাহস নেই। তাই যায়যায়দিন-এর সাহসী লেখকদের কাহিনীর সঙ্গে মিলিয়ে নেবো নিজের অনুক্ত কাহিনী।

সাতবাড়িয়া, ভেড়ামারা থেকে

রং নাম্বারের রং ফ্রেন্ড

– মাদমিকসুল রিমন

২০০৩ সালে বিএনবি-এর আইএসএসবি পরীক্ষায় রিজেক্টেড হয়ে বাসায় চলে এলাম। বাসায় এসে মনে পড়তে লাগলো আইএসএসবি-র স্মৃতিময় চারটি দিনের কথা, বন্ধুদের কথা, নিজামভাই-এর কথা। আমার গ্রুপের পাভেল আইএসএসবি-তে উত্তীর্ণ হয়েছিল। ভাবলাম পাভেলকে একটা ফোন করি। পাভেলের মোবাইল নাম্বার আমার নোটবুকে ছিল। সেটা একটা কাগজে টুকে নিলাম।

একটা ফোনের দোকান থেকে ফোন করছি। ওপাশে রিং হচ্ছে কৃং কৃং, কৃং। ফোন রিসিভড হলো। একটি সুমিষ্টি মেয়েলি কণ্ঠ ভেসে এলো, আসসালামু আয়ালাইকুম।

এ রকম একটি সুললিত কণ্ঠের জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। বুকটা ধড়াস করে উঠলো। পাভেলকে চাইলাম।

কিন্তু মিষ্টি কণ্ঠটি আমাকে হতাশ করে দিয়ে জানালো, পাভেল নামের কাউকে সে চেনে না।

ফোন রেখে দিলাম। ভাবলাম নাম্বার চাপতে সম্ভবত ভুল করেছি।

বিকেলের দিকে আবার ফোন করলাম।

আবারও শুনতে পেলাম সেই সুললিত ঝংকার, আসসালামু আয়ালাইকুম।

এবার পাভেলের পরিচয়সহ সবিস্তারে বললাম।

কিন্তু এবার, সে সুমিষ্ট সুরটি কুমিষ্ট হয়ে বললো, পাভেল-টাভেল কাউকে চিনি না, এটা পাভেলের মোবাইল না।

মনটা খারাপ হয়ে গেল।

বাসায় এসে নোটবুকে লেখা পাভেলের মোবাইল নাম্বারের সঙ্গে আমার চিরকুটে লেখা নাম্বারটা মেলাতে গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম।

কারণ...।

নোটবুকে লেখা আছে 01...8583 আর আমার চিরকুটে লেখা ০১...৪৫৪৩। বোঝা গেল ভুলের কারণটা। পাভেলের নাম্বারে ফোন করে ঠিকই পাভেলকে পেলাম। কিন্তু সুমিষ্ট কণ্ঠটির কথা ভুললাম না।

পরে এক সময় সরি বলার জন্য এবং আমার ভুলটির কথা জানানোর জন্য সুমিষ্ট কণ্ঠটির কাছে ফোন করলাম।

সুমিষ্ট কণ্ঠটি আরো সুমিষ্ট হয়ে মনে বিধলো। পরিচয় জানলাম। নাম ইভা, ডেন্টাল কলেজে পড়ছে।

তাকে বললাম, আপনার সঙ্গে আমার এই কানেকশনটা অনন্য সাধারণ একটা ঘটনা, আমি এটাকে ধরে রাখতে চাই।

ইভা জানতে চাইলো তাকে কি করতে হবে।

বললাম, কিছুই না, শুধু মাঝে মধ্যে ফোন রিসিভ করা।

হাসি মাখা কণ্ঠে জবাব এলো, OK.

এর পর থেকে শুরু মোবাইল ফ্রেন্ডের সঙ্গে কথা বলা। সপ্তাহে দুই তিন দিন, কখনো দিনে দুই তিনবার। সব গুরুত্বহীন, অর্থহীন, ভ্যালুলেস কথাবার্তা।

এখন ভাবতে লজ্জা লাগে, নিজেকে ছ্যাবলা ছ্যাবলা লাগে।

অনেক দিন চলেছিল এভাবে।

এখন আমাদের বন্ধুত্ব নেই। তুচ্ছ আঘাতে ভেঙে গেছে বালির ঘরের মতো সে বন্ধুত্ব। তাকে এখন ভুলতে চেষ্টা করছি যদিও জানি, সে আমার হৃদয়ে বেচে রবে এক রহস্যময়ী, অজানা-অদেখা আপন হয়ে।

সেই রহস্যময়ী বোকা ইভাকে জানাই ভ্যালেনটাইনস ডে-এর শুভেচ্ছা। যদিও সে ছিল আমার রং নাম্বারের রং ফ্রেন্ড।

টাঙ্গাইল থেকে

নীলা

– সাহাবউদ্দিন

আমি স্থির চিত্তে আমার অক্ষমতার কথা বললাম। ওকে বোঝালাম। নীলা বুঝ মানেনি। কাদতে লাগলো। অঝোর বৃষ্টির ধারায় আমি যেন ভিজছি! নীলা কান্নার বৃষ্টিতে নিজকে ভিজিয়ে দিল! সে মন ভরে ভিজলো! আমার অক্ষমতার দোষে অপরাধী হয়ে তার ভালোবাসার জেলখানায় যেন চিরকয়েদি হয়ে রইলাম।

নীলাকে বোঝাতে চাইলাম ওর-আমার পাহাড়সম ব্যবধান। তার সুন্দর, নিশ্চিত ভবিষ্যৎ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তার সেই সুন্দর ভবিষ্যতের রাজকুমার আমি নই, অন্য কেউ!

নীলার কাছ থেকে সেদিন চলে এলাম! আমার অক্ষমতার দুঃখে শোকের নদীতে নীলাকে ভাসিয়ে দিয়েছি। দুঃখ আর শোকে নীলাদের বাসায় যেতে পারি না, যাই না। রাতের আকাশের তারা গুণতে গুণতে আমার অনেক দিন পার হয়ে গেল। নীলাকে দেখি না। নীলার জন্য খুব কষ্ট হয়। নীলার নীল শাড়ির অসাধারণ সুন্দরের মাঝে স্বপ্নের মাঝি হয়ে ভাসি। স্বপ্ন আর বাস্তবে ব্যবধানের দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আমার স্থির থাকা দায়। এসব কষ্ট থেকে আবার পালিয়ে বেড়াতে ইচ্ছে করছিল। সব কিছু নিয়তির হাতে ছেড়ে দিয়ে একদিনের ভরসা করলাম! অনেক দিন, মাস পার হলো। কয় মাসের ব্যবধানে আমার বিদেশ যাওয়ার ব্যবস্থা হলো।

বিদেশ চলে গেলাম। দুই বছর গড়িয়ে গেল। নীলার সঙ্গে যোগাযোগ নেই! তাদের কারোর সঙ্গে না। মাঝে মধ্যে ভাবি, নীলা হয়তো নীল পাথর হয়ে আছে। একদিন হঠাৎ খবর পেলাম নীলার বিয়ে! কালের আবর্তে দুঃখ, শোক যেন আমার মাঝ থেকে দূর হয়ে গেছে। দেশে গেলাম! নীলা কেমন আছে জানার জন্য মন আমার ব্যাকুল। নীলাদের বাসায় গেলাম, সবাই এলেন। পরম মমতায় সবাই আমাকে গ্রহণ করলেন। সবার মাঝে নীলা নেই। বুকটা হাহাকার করে উঠলো।

খালাআম্মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, নীলা কেমন আছে?

বললেন, নীলা খুব সুখে আছে। তোমার কথা সব সময় বলে!

নীলার ঠিকানা চেয়ে নিলাম। নীলাকে না দেখলে নয়! নীলাকে দেখতে গেলাম। নীলার বাসার দরজার সামনে আমি দাড়িয়ে।

নীলা দরজা খুললো। দুজন দুজনের চোখে বিদ্ধ। নীলা মৃদু হাসলো যেন ফিরে গেলাম আগের কোনো এক বিকেলে!

সউদি আরব থেকে

আবেগ

– আনুশকা

প্রথম তার সঙ্গে আমার দেখা সিটি রেলস্টেশনে। দেখি মেয়েলি চেহারার ফর্শা, দীর্ঘদেহী, প্রচণ্ড স্মার্ট একটি ছেলে স্টেশন সিকিউরিটি অফিসারের সঙ্গে নিখুত ইংরেজি একসেন্টে কথা বলছে। ইংরেজি একমেন্ট তো বটেই, চেহারাও বাংলাদেশিদের মতো নয়।

সিডনি–তে এসেছি মাত্র তিন দিন হয়েছে। ওই দিন ছিল কলেজে ওরিয়েন্টেশনের দিন। কলেজের রাস্তা যখন হন্যে হয়ে খুজছি তখনো দেখলাম তাকে। শীষ দিতে দিতে ড্যাম কেয়ার ভঙ্গিতে রাস্তা ধরে এগোচ্ছে।

ব্যস্ত মতো অনেক খোজাখুজি করে যখন ওরিয়েটেশনে পৌছালাম তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। ইনভিটেশন রুমে বসে পড়লাম এনরোলমেন্ট ফরম হাতে।

হঠাৎ দেখলাম কলম পাচ্ছি না। তাড়াহুড়োর মধ্যে বাসায় ফেলে এসেছি। এদিক–ওদিক তাকাচ্ছি, কাউকে বলতেও পাচ্ছি না। সবাই অপরিচিত বিদেশি।

আপনি আমার কলমটা নিতে পারেন। আমার লেখা শেষ হয়ে গেছে।

সেই নিখুত একসেন্ট। তার কলমটা আমার দিকে এগিয়ে দিল।

ক্যান্টিনে গেলাম ওরিয়েন্টেশন শেষে। তাকে দেখলাম কাপুচিনো খাচ্ছে। হাতে সিগারেট। পাশে পুতুলের মতো একটি মেয়ে। খুব সম্ভবত জাপানিজ। ওরিয়েটেশনের সময়ে তার পাশে ছিল। তার কলমটা ফিরিয়ে দিলাম। ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের পরিচয় দিলাম। আমার দেশের নাম জেনে খাটি বাংলায় সে নিজের পরিচয় দিল। মজার ব্যাপার হলো, সে আমার চেয়েও নতুন। কাল রাতে সিডনি এসেছে। কিন্তু সে বাংলাদেশি জেনে আমার ভেতর যে আনন্দের জোয়ার বয়ে যাচ্ছিল তা ওর ভেতর সঞ্চারিত হলো না।

কফি শেষ করেই সে উঠলো। যাওয়ার আগে হঠাৎ কি মনে করে বললো, সরি, আপনার নামটা?

নাম বলতেই সে বললো, আমি মেহেদি। টেক ইট ইজি। টেক কেয়ার। বাই।

আমার ধারণা ছিল, তার মতো ছেলেরা চিরজীবন সুন্দর চেহারার অপব্যবহার আর বিলাসিতা করেই সময় কাটায়। ক্লাস শুরুর অল্প দিন পরেই বুঝলাম, সে জাতে মাতাল কিন্তু তালে ঠিক। প্রচণ্ড ক্যারিয়ার সচেতন এবং পড়াশোনায় খুব ভালো। ফাস্ট ট্র্যাকে ডাবল কোর্স নিয়ে দুই বছরের ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স অনেক আগেই শেষ করে ইউনিভার্সিটিতে ক্রেডিট ট্রান্সফার করে ফেললো। পাশাপাশি পার্টটাইম চাকরি করে নিজের স্টকে ডলার এবং ক্রেডিট কার্ডেরও কোনো অভাব রাখলো না।

কিন্তু একটা জিনিসের অভাব তার ছিল। সেটা হলো আবেগ।

না। সে বর্ণবাদী বা অহংকারী ছিল না! সে আমার খুব ভালো একজন বন্ধু ছিল। আমার অনেক বিপদে যার অধিকাংশই ছিল আর্থিক সে আমাকে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করেছে।

কিন্তু প্রথম দিন থেকেই তাকে আমি যেটা বলতে চেয়েছি তা সে বলতে দেয়নি। সহজাত কৌশলে নিপুণভাবে কাটিয়ে গেছে।

কিন্তু আমি পারিনি। উচ্চাকাঙ্ক্ষী এই ছেলেটির সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয় সিডনি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে। আমার মানসিক অবস্থা জেনে মা আমাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য দেশে ফিরতে বলেন। এয়ারপোর্টে অল্প কয়েকজন বন্ধুর মধ্যে তাকেও দেখলাম। পাশে সেই জাপানিজ মেয়েটি। তার কাছে যেতেই সে আমাকে ফিশ ফিশ করে বললো, তুমি দেশে যাচ্ছো?

বললাম, ফুল নিয়ে এসেছো, তারপরও আমার দেশে যাওয়া নিয়ে সন্দেহ হচ্ছে?

সে আমার দিকে অপলকভাবে তাকালো।

সেই তীক্ষ্ম দৃষ্টি মানুষের ভেতরের সব কিছু জেনে নেয়।

সে আস্তে কিন্তু কঠোরভাবে বললো, তুমি ভুল করছো। একদিন তুমি জানবে, আমিই ঠিক ছিলাম। দেশের অবস্থাই তোমাকে বুঝিয়ে দেবে। অবশ্য মেয়েদের কোনো চিন্তা নেই।

ইমিগ্রেশন এরিয়ায় পা রেখে শেষবারের মতো পেছন ফিরে তাকালাম।

সবাই হাত নাড়িয়ে বিদায় দিচ্ছে। আর একটু দূরে বসে মুখ ঢেকে বসে আছে সে।

কাদছে বোধহয়। তাকে জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে তার জাপানিজ বান্ধবী।

তার এই অসহায় অবস্থা ছিল আমার দেখা এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য।

সিডনি থেকে

এক পশলা বৃষ্টি

– ফাল্গুনী

প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাস এলেই ভাবি এবার *ভালোবাসা* সংখ্যায় লেখা পাঠাবো। লিখতে বসে খুজে পাই না কি লিখবো। কারণ ভালোবাসার গল্প লেখার মতো আমার কোনো গল্পই নেই। তাই অপেক্ষায় থাকি যায়যায়দিন–এর *ভালোবাসা* সংখ্যার জন্য। এর ভেতরে লেখা অসংখ্য ভালোবাসাপ্রেমীদের গল্পগুলো পড়ে নিজে তৃপ্ত হই। যাযাদির এই বিশেষ সংখ্যার প্রতিটি সংখ্যাই আমি সংগ্রহে রাখি এবং সারা বছর ধরে উল্টে–পাল্টে পড়ি আর অপেক্ষায় থাকি নতুন আরেকটি সংখ্যার।

ভালোবাসায় গল্প নেই বলে কিন্তু একেবারে আবেগহীন নই। আর সবার মতো চেয়েছি আমাকে কেউ সত্যিকারভাবে ভালোবাসবে এবং আমিও। তাই স্বচ্ছ ভালোবাসা পাওয়া, না পাওয়ার দ্বন্দ্বে নিজেকে প্রেম নামে ভালোবাসায় কখনো জড়াইনি। কতোজনার মতো আমিও চেয়েছি মনে–প্রাণে কেবল স্বামীকেই ভালোবাসবো এবং বেসেছিও। বিয়ের পর প্রকৃত ভালোবাসার আশায় এতোটাই আবেগী ছিলাম যে, তার সব কিছুই আমার ভালো লাগতো। বিশেষ বিশেষ দিনগুলোতে বিশেষ উপহারের সারপ্রাইজ, কথায় কথায় এটা–সেটা কেনা এসব কিছু আমাকে তার প্রতি আরো দুর্বল করে তুলতো। কিন্তু পরে বুঝলাম, এই উপহার দেয়া কিংবা নেয়ার ব্যাপারগুলো তার কাছে প্রতিদিনকার অফিশিয়াল কাজের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। দেখলাম উচ্ছিষ্ট কাগজের ভাজে আমার দেয়া কার্ডগুলো পড়ে আছে হয়তো তার অজান্তেই। তার সব আবেগ ও ভালোবাসা কেবল নিজের প্রয়োজনেই উথলে ওঠে, বাইরে থেকে যতোটা অগোছালো, ভেতরে ঠিক ততোটাই গোছালো সে।

গুছিয়ে নিয়েছি নিজেকেও। এখন আর অল্পতেই আবেগে আপ্লুত হই না। একাকী কোথাও যাওয়ার বায়নাও ধরি না। ভরা পূর্ণিমায় সারা রাত বারান্দায় বসে কাটাই না। কেননা এসব কিছু তার কাছে পাগলামী ছাড়া কিছুই না।

এই দশ বছরে সুখে থাকার অভিনয়টা ভালোই রপ্ত করেছি আমি। তাই তো বন্ধুদের কাছে আমি ভাগ্যবতী স্ত্রী, আর মা–বাবার কাছে ভাগ্যবতী মেয়ে। আমার হৃদয় নিংড়ানো সব ভালোবাসা আমি আমার সন্তানদের বিলিয়ে দিয়েছি। এখন তারাই আমার সুখ–দুঃখের আশ্রম। ওদের সঙ্গেই হাসি, ওদের সঙ্গেই কাদি, ওদের কোলে মাথা রেখে সান্ত্বনা খুজি।

গত কয়েক বছর ধরে ভ্যালেনটাইনস ডে–তে ওদের জন্যই উপহার কিনি। খুব খুশি হয় আমার তিন বছরের মেয়ে আর পাচ বছরের ছেলে।

প্রতি সপ্তাহে অভ্যাসবশত আমার জন্য কেনা যাযাদির সঙ্গে কখন যে একটা *ভালোবাসা* সংখ্যা আমার হাতে তুলে দেয় তা হয়তো আমার স্বামী জানতেই পারে না। কিন্তু ওটাই হয় আমার ভালোবাসার শ্রেষ্ঠ উপহার।

তাই আমার অনুরোধ, এই ভালোবাসা সংখ্যার প্রকাশনা কখনোই যেন বন্ধ না হয়। তাহলে প্রখর রোদে এক পশলা বৃষ্টির মতো আমার স্বামীর এটুকু ভালোবাসা থেকেও আমি বঞ্চিত হবো।

ঢাকা থেকে

নষ্ট জীবন

– সাথী

আমি বর্তমানে একজন পতিতা। *পতিতা* শব্দটি শুনে ভদ্র সমাজের মানুষ নাক সিটকিয়ে ওঠেন। কিন্তু ভদ্র সমাজের লোকেরাই আমাদের মতো পতিতার কাছে বেশি আসে। আবার বাইরে তারাই মিটিং, মিছিল, মঞ্চে বক্তৃতা দেয় পতিতা উচ্ছেদের পক্ষে। আবার আমরা যখন আন্দোলন করি পতিতাদের যৌনকর্মী হিসেবে স্বীকৃতি চাই তখন এরাই বলে এদেরকে স্বীকৃতি দেয়া উচিত।

আসলে পতিতারা চিরকালই সমাজে অবহেলিত। সভ্যতার আলো এদের গায়ে লাগতে দেয় না। সমাজের সমাজপতি নামধারী কিছু মানুষ। আবার এদের ছত্রছায়ায় থেকেই আমাদের মতো পতিতারা পতিতাবৃত্তি চালিয়ে যায়। আমাদেরও যে মন আছে, এ মনে ভালোবাসা আছে সেটা কেউ বুঝতে চায় না।

এবার আসল ঘটনায় আসি। আমার বাড়ি ফরিদপুর জেলার ভাঙা থানার অন্তর্গত বালিয়াচরা নামে একটি গ্রামে। সে গ্রামের সবুজ নামের একটি ছেলে আমাকে ভালোবাসতো। আমিও জীবনের প্রথম ও শেষ ভালোবাসা মনে করে তাকেই ভালোবাসতাম। আমি ওর জন্য জীবনও দিতে পারতাম। সে আমাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দেয়। আর আমিও বিশ্বাস করে আমার সব কিছু ওকে উজাড় করে দিই।

এক রাতে ও আমাকে ওদের বাড়ির পেছনে একটা খড়গাদার পাশে নিয়ে যায় এবং পর পর তিনবার আমার সঙ্গে যৌনক্রিয়া চালায়। আমার সতীচ্ছদ যখন ছিন্ন করে তখন চিৎকার করে উঠি। ও আমাকে ওর বুকের সঙ্গে চেপে ধরে ঠোঁট চুষতে থাকে আর বলে, তুইতো আমারই।

এভাবে দিনের পর দিন ওর সঙ্গে আমার মিলন চলতে থাকে। এক সময়ে আমি গর্ভবতী হয়ে পড়ি। ও আমাকে ফরিদপুর নিয়ে আসে এবং এক ক্লিনিকে গর্ভপাত ঘটায়।

তারপর বলে, চল, আমরা যশোর চলে যাই। ওখানে আমি রিকশা চালাবো আর একটা বন্ধু আছে ওর বাড়িতে থাকবো। এই বলে আমাকে নিয়ে আসে। এসে একটা হোটেলে আমাকে রেখে বাইরে যায়। ফেরে রাত দশটার দিকে। তার সঙ্গে একটা লোক। সবুজ আমাকে বলে, সে তার বন্ধু। তারপর বন্ধুটি চলে যায়। রাতে শেষবারের মতো সবুজ আমার সঙ্গে মিলিত হয়। খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠে দেখি পাশে সবুজ নেই।

ভাবলাম হয়তো বাইরে কোথাও গেছে। একটু পরে গত রাতের সেই লোকটা এলো। এবং বললো সবুজ আমার বাড়িতে। তোমাকে নিতে পাঠালো এই বলে আমাকে নিয়ে এলো মারোয়াড়ি মন্দিরের পাশে একটা গলিতে।

যশোরের কোনো কিছু ভালো করে চিনি না।

গলির ভেতর ঢুকতেই দুই তিনটা মেয়ে আমাকে নিয়ে এলো এবং একটা ঘরে আটকে রাখলো।

ক্লাস নাইনে লেখাপড়া করার সুবাদে আমার আর বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, কি হয়েছে বা কি হতে যাচ্ছে। তারপর সারা রাত ধরে আমার ওপর চললো নির্যাতন।

পরদিন একটা মোটাসোটা মহিলা একটা পুরুষ সঙ্গে করে নিয়ে এলো। ওই মহিলাটা এখানকার সর্দারণী। সর্দার চলে গেলে ওই লোকটা আমার ওপর ঝাপিয়ে পড়লো। কুকুরের মতো। আমার স্তন কামড়ে রক্ত বের করে দিল। বহুক্ষণ এভাবে ধর্ষণ চালানোর পর সে গেল।

তারপর থেকেই আমার এই পতিতা জীবন।

এখন অভ্যাস হয়ে গেছে।

আমার এ ঘটনাটা যদি পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাহলে সবুজের মতো সমাজের নরপশু কুকুররা আর কোনো মেয়ের জীবন নষ্ট করতে পারবে না। সবাইকে শুভেচ্ছা।

মাড়োয়ারি মন্দির যশোর থেকে

সীমান্ত গাথা

– জসীমউদ্দিন

নদীর দিকে অর্থ পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সীমান্ত বললো, তোমার কি হয়েছে আমাকে সব খুলে বলো।

সীমান্তের কথার কোনো উত্তর না দিয়ে এক দৃষ্টিতে অন্যদিকে তাকিয়ে রয়েছে। তার চেহারায় কেমন একটা বন্য উন্মাদনা ফুটে উঠছে। এমন আচরণ সীমান্তের কাছে একেবারেই আনকোরা নতুন। তাই ভেতরে ভেতর একটা ভয় ভয় অনুভূতি হচ্ছে। যদিও তা বাইরে প্রকাশ করছে না। নদীর চোখ বেয়ে পানি ঝরছে ফোটা ফোটা। নদী কি কাদছে?

নদীর দুই বাহু ধরে সীমান্ত বললো, তুমি শান্ত হও প্লিজ। তুমি যা বলবে আমি সব শুনবো।

সীমান্তের কোনো কথাই নদী শুনছে বলে মনে হলো না। বৃষ্টির পানি এবং নদীর চোখের পানি এক হয়ে গড়িয়ে পড়ছে চিবুক বেয়ে। নদী ফোপাতে ফোপাতে বলে উঠলো, প্লিজ, আমাকে মাপ করে দাও। আমাকে ভুলে যাও। তোমার আর আমার মাঝে আকাশ–পাতাল তফাত। আমার ফ্যামিলি এ সম্পর্ক কখনো মেনে নেবে না। তাছাড়া আমার ফ্যামিলিকে কখনো দুঃখ দিতে পারবো না আমি। তোমাকেও আমি মোটেই সহ্য করতে পারছি না।

এক নাগাড়ে কথাগুলো শেষ করে দম নিল নদী। তবে কান্নার বেগ যেন বেড়েই চলছে মেঘলা বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

সীমান্ত ঘটনার আকস্মিকতায় কি বলবে বা কি করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছে না। যা শুনলো তাতে লজ্জা, অপমানে মাটি থেকে চোখ তুলেও তাকাতে পারছে না। এভাবে কতোটা সময় বয়ে গেল মনে নেই। অনেকক্ষণ পর নদীর দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো সীমান্ত। নদীর চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুন বের হচ্ছে। মুখের প্রতিটি রেখা কাপছে, সঙ্গে ঠোট দুটোও। তাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন, কালনাগিনী ছোবল দেয়ার আগে রাগে ফুসছে। সীমান্তের দিকে নদী দুই কদম এগিয়ে এলো সামনে।

সীমান্ত একটু ভয় পেল যেন! তার ওপর ঝাপিয়ে পড়বে নাকি? সীমান্ত তার শুকিয়ে যাওয়া ঠোট দুটো জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিল। একটু সাহস করে নদীর দিকে তাকিয়ে বললো, তুমি পাগলের মতো এসব কি বলছো? আমাদের এতোদিনের সম্পর্ককে এক ফু মেরে উড়িয়ে দেবে?

কথাটা শুনে নদীর চোখ দুটো চিতা বাঘের চোখের মতো জ্বলে উঠলো দপ করে। নদী হুংকার দিয়ে প্রচণ্ড দৃঢ়তার সঙ্গে বলা শুরু করলো, আমি তোমাকে কখনো ভালোবাসিনি। যা করেছি তার পুরোটাই মিথ্যা এবং অভিনয়। ভুলে যাও, সব ভুলে যাও। এটাই আমার শেষ কথা। বলে হাটতে লাগলো যেদিক দিয়ে এখানে এসেছে সেদিকে।

সীমান্ত ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া ঘোর লাগা মানুষের মতো নদীর পাশাপাশি হাটতে লাগলো। মেইন রোডে এসে থেমে গেল তারা। বা পাশের ফুটপাথে দাড়িয়ে নদী এদিক–ওদিক তাকালো খালি রিকশার খোজে।

সীমান্ত একটি খালি রিকশাকে ইশারা করলো এদিকে আসতে।

নদী রিকশায় উঠেই হুড তুলে মাথাটা বাইরে এনে সীমান্তের দিকে তাকালো। চোখ–মুখ রাগান্বিত করে বলে উঠলো, আর কোনোদিন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে না।

রিকশাটা একটু নড়ে চলতে শুরু করলো রাজকীয় চালে। সীমান্তে চুপসে যাওয়া বেলুনের মতো হতবাক। পরাজিত সৈনিকের মতো ফুটপাথে দাড়িয়ে রইলো। রিকশাটি যেদিকে গেছে সেদিকে তাকিয়ে যেন নক্ষত্রের পানে অনন্তকালের তৃষ্ণার্ত সেই দৃষ্টি।

সেদিন থেকে সীমান্তের জীবনের সুতাটাই যেন কেটে গেল। হয়ে গেল ছন্নছাড়া বাধনহীন। চারদিকে যেন অবিশ্বাসের কালো হাত আর প্রতারণার জালে ঘেরা পৃথিবী। কোথাও কি বিশ্বাস নেই? নেই বেচে থাকার

সামান্য আমন্ত্রণ। এভাবেই কাটছে দিন, মাস, বছরগুলো। সীমান্ত যে আর পারছে না। অবিশ্বাস এবং একাকীত্বের ঘানি টানতে টানতে সে এখন ক্লান্ত, ভীষণ ক্লান্ত।

সউদি আরব থেকে

ভুল

– ফারুক

আমি তখন সিটি কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র। ধানমন্ডিতে একটা মেসে থাকতাম। আমার ঘরটি ছিল অনেকটা চিলেকোঠার মতো। তার পেছনেই ছিল বাড়িওলার সুরম্য অট্টালিকা।

বাবাকে ছেড়ে প্রথম বাইরে থাকার কারণে সব সময় মন খারাপ ভাব নিয়ে থাকতাম। সবচেয়ে বেশি খারাপ কাটতো সন্ধ্যার সময়টা। এ সময় ঘরে কেউ থাকতো না। নিঃসঙ্গ একা জানালা দিয়ে আকাশের পানে তাকিয়ে থাকতাম আর মনে মনে কি যেন ভাবতাম।

আমার সকল নিঃসঙ্গতা দূর করতে ঠিক তখনই এগিয়ে এলো নিঝুম। বাড়িওলার ছোট মেয়ে। আগে জানলে হয়তো কখনোই তার বাবা–মা তার মতো একটি চঞ্চল ও উচ্ছল মেয়ের নাম চঞ্চলা না রেখে নিঝুম রাখতো না।

একদিন সন্ধ্যার সময় নিঝুম এসে আমাকে প্রশ্ন করলো, আচ্ছা, আপনি প্রতিদিন এ সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে কি দেখেন? নাকি ভাব মারার চেষ্টা করেন?

কি বলবো কিছুই খুজে পাচ্ছি না। কেবল তার সেই অপরূপা মুখের দিকে চেয়ে থেকেছি।

এভাবেই নিঝুম হঠাৎ করে এসে আমাকে নানান বাক্যবাণে জর্জরিত করে। আবার হঠাৎ করেই চলে যায়।

ধীরে ধীরে তার সঙ্গে আমার শখ্যতা বেড়ে ওঠে। এক সময় এমন হয় যে, সে নানান অজুহাতে, নানান ছল–ছুতোয় একটু সুযোগ পেলেই আমার কাছে চলে আসতো। আমিও যেন তার সান্নিধ্য লাভের অপেক্ষায় বসে থাকতাম। এভাবে চলতে থাকে অনেক দিন।

একদিন নিঝুম এসে বললো, আজ যে পূর্ণিমা তা জানেন?

বললাম, হ্যা, পূর্ণিমা আমার খুব প্রিয়। আমার একটা বাজে অভ্যাস আছে।

কি সেটা?

পূর্ণিমার রাতে শুকতারা না ওঠা পর্যন্ত জেগে থেকে জ্যোস্না দেখা।

সে দ্রুতগতিতে বললো, আজ আমাদের ছাদ থেকে জ্যোস্না দেখবেন। আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে। আমি মাঝ রাতে ছাদে আসবো। প্লিজ ছাদে থাকবেন।

জীবনে প্রথম কোনো মেয়ের আমন্ত্রণ পেলাম, তাও আমার খুব প্রিয় একটি রাতে।

প্রতীক্ষার প্রহর গুণতে থাকি।

অবশেষে সেই কাঙ্ক্ষিত লগ্ন এসে উপস্থিত হলো। আমি একটা একটা করে সিড়ি পার হয়ে এগিয়ে গেলাম আমার প্রিয় মানুষটির কাছে।

সে আমার আগেই এসেছে। আমাকে দেখে সে ধীর পায়ে খানিক এগিয়ে এসে আমার সামনে দাড়ালো।

বললাম, কিছু বলবে নিঝুম?

সে নির্ভয়ে আমার হাত দুটো ধরে বললো, তুমি আমাকে ভালোবাসা দাও।

আমি আবেগে তাকে জড়িয়ে ধরলাম। মুহূর্তেই যেন হারিয়ে গেলাম অনেক উপরে যেখানে দাড়িয়ে চাদটিকে খুব সহজেই হাত দিয়ে ছোয়া যায়।

এভাবে বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। আমি কল্পনার সব কয়টি আকাশ এক এক করে পাড়ি দিচ্ছি।

হঠাৎ শুনি নিঝুম বলছে, আপনি এমন করছেন কেন? আপনাকে তো বেশ ভালো বলেই জানতাম, হাত ছাড়ুন, না হয় আমি আম্মাকে ডাকবো।

কিছুই বুঝতে পারলাম না । একটু আগে যার হাত ধরে জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিশে যাচ্ছিলাম, যাকে সঙ্গী করে স্বপ্নের আকাশ পাড়ি দিচ্ছিলাম তার মুখে একি কথা!

পেছনে ফিরে দেখি বাড়িওয়ালি আন্টি অর্থাৎ নিঝুমের আম্মা।

মুহূর্তেই আমার মেরুদণ্ড দিয়ে শির শির করে কি যেন বয়ে গেল। নিজেকে স্থির রাখতে পারছিলাম না। এক ভয়ংকর আড়ষ্টতা যেন আমার গলা চেপে ধরলো, যেন অনেক কিছুই বলার চেষ্টা করছি। কিন্তু কিছুই বলতে পারছি না। শুধু অসহায় চোখে নিঝুমের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

আশ্চর্য ! যে মেয়েটিকে একটু আগে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী মনে হয়েছিল সে এখন যেন একটা কুৎসিত প্রাণীতে পরিণত হয়েছে।

এখন আর আমি পূর্ণিমায় জ্যোৎস্না দেখি না। ভোরের আকাশের শুকতারাটি এখন আমাকে মুগ্ধ করে না । তবুও পূর্ণিমায় জানালা দিয়ে মনের ভুলে দুচোখ বাইরে যায়। কে যেন ইশারা দিয়ে বাইরে যাওয়ার নিমন্ত্রণ জানায়। সঙ্গে সঙ্গেই চোখ বন্ধ করি এবং ভাবি, ভুল, সবই ভুল।

ঢাকা থেকে

কামরূপ কামাক্ষার সাধুবাবা

– আশফাকুল জলিল

ভোরবেলাতেই নীলকুট পাহাড়ের ওপরে স্থাপিত কামরূপ কামাক্ষার সীতা দেবীর মন্দির দর্শনের জন্য বেরোলাম। কথিত আছে, দেবতা শিবের স্ত্রী সীতা দেবীর পিতা দক্ষ মহাযজ্ঞের আয়োজন করেন। নিমন্ত্রিত না হলেও সীতা সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। কিন্তু সেখানে স্বামী শিব সম্বন্ধে তার পিতা নিন্দা করলে সীতা সে স্থলেই দেহ ত্যাগ করেন। পত্নীর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করে ক্রুদ্ধ শিব যজ্ঞ মূলে আসেন এবং সীতার মরদেহ স্কন্ধে নিয়ে ভীষণ নৃত্য শুরু করেন। এর ফলে পৃথিবী বিলুপ্ত হওয়ার আশংকা দেখা দিলে ভগবান বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দ্বারা সীতার দেহ খণ্ড-বিখণ্ড করতে লাগলেন। সতীর দেহ একান্ন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পতিত হয় এবং সেই স্থানগুলো *মহাপীঠ* নামে খ্যাত হয়। সীতার যোনিদেশ খণ্ডিত হয়ে নীলকুট পর্বতের শীর্ষে পতিত হয়ে শিলায় রূপান্তরিত হয়। কামাক্ষার গর্ভ মন্দিরে স্থাপিত এই শিলাকে মানুষ যুগ যুগ ধরে পূজা করছে।

পাণ্ডার সঙ্গে প্রদীপের আলোয় আলোকিত সিড়ি দিয়ে নেমে কামাক্ষার গুহা মন্দিরে প্রবেশ করি। বর্গক্ষেত্রাকার শিলা পিঠে স্থাপিত সীতার দেহাঙ্গের মধ্যস্থল থেকে পানি বেরিয়ে আসছে। অঙ্গটির অর্ধাংশ সোনার টোপর, কাপড় আর গোলাপ ফুল দিয়ে ঢাকা। দৈর্ঘ আঠারো ইঞ্চি এবং প্রস্থে সাত ইঞ্চির মতো হবে। প্রবাদ আছে যে, সীতার এই অঙ্গ স্পর্শ করলে মানুষ দেবত্ব লাভ করে অর্থাৎ নিষ্পাপ হয়ে যায়। সীতা দেবীর দেহাংশ দর্শন এবং স্পর্শ করে গর্ভ মন্দির থেকে বের হয়ে এলাম।

মন্দিরের বাইরে পুরনো বৃক্ষের ছায়াতে বসে এক জ্যোতিষী সাধুবাবা হাত দেখছিলেন। কয়েকজন বিদেশিও দেখা যাচ্ছে সেখানে। হাত দেখিয়ে সবাই বিদায় হতেই আমি সাধুবাবার পাশে গিয়ে বসলাম। বললাম, হস্তরেখার বিচার আমিও কিছুটা পারি বটে তবে দক্ষতা লাভের জন্য মৌলিক বিষয়গুলো সম্বন্ধে বিস্তারিত শিখতে চাই। এ ব্যাপারে কি আমাকে সাহায্য করবেন? বিনিময়ে আমি সাধ্যমতো দক্ষিণা দিতে প্রস্তুত আছি। মৃদু হেসে সাধুবাবা রোজ সকালে আমাকে ঘণ্টা তিনেক সময় দিতে রাজি হলেন।

সপ্তাহ খানেক বাদে আশপাশের মন্দিরগুলো ঘুরে দেখা, সেই সঙ্গে হস্তরেখা বিদ্যায় আমার তালিম নেয়া শেষ হয়ে গেল। সাধুবাবা হাত দেখা বিষয়ে শেষবারের মতো নানান রকম আলোচনা করলেন। তার প্রাপ্য দক্ষিণা গতকালই পরিশোধ করেছি। এখন আমার কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পালা। বিদায় নেয়ার আগে সাধুবাবাকে বললাম, আপনার হাতখানা দিন না, আমার শিক্ষা কতোদূর হলো পরীক্ষা করে দেখি।

সাধুবাবা একটু অবাক হয়ে কি যেন ভাবলেন। তারপর তার হাতখানা আমার দিকে প্রসারিত করলেন।

খানিকক্ষণ ভালো করে হাতের তালুর বিভিন্ন রেখা পরখ করে নিয়ে মৃদু হেসে বললাম, আপনার হৃদয় রেখাতে বুধের ক্ষেত্রের নিচে দ্বীপ চিহ্ন আছে। তাছাড়া শুক্রের ক্ষেত্র থেকে একটা রেখা এসে হৃদয় রেখাকে কেটে গেছে, সেই সঙ্গে বৃদ্ধাঙ্গুলি বক্রভাবে অবস্থিত। এর অর্থ, সামাজিকভাবে স্বীকৃত নয় এমন কারো সঙ্গে আপনার গভীর যৌন সম্পর্ক হয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত তা প্রকাশিত হয়ে যাওয়াতে আপনার ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে।

এটুকু বলতেই সাধুবাবা হাতখানা টেনে নিলেন। কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, তোমার হস্তরেখা বিদ্যার শিক্ষা মন্দ হয়নি। তবে আরো চর্চা চালিয়ে যেতে হবে। আমার হাত দেখে যা বলেছো তা ঠিকই আছে। যাবার আগে আমার বিপর্যয়ের কাহিনী শুনে যাও।

সাধুবাবা ঝোলা থেকে গাজা বের করে ধীরে-সুস্থে কলকি সাজালেন। কলকিতে খান দুই গভীর টান দিয়ে ইঞ্জিনের মতো ধোয়া ছেড়ে শুরু করলেন তার ভাগ্য বিপর্যয়ের কাহিনী।

আমার মামা ছিলেন পাইলট। পাইলট হওয়ার জন্য ফ্লাইং ক্লাবে ট্রেনিংয়ে থাকাকালে তার ইমেজ ছিল অনেকটা প্লেবয়দের মতো। লম্বা, স্মার্ট, সুদর্শন মামার অনেক বান্ধবী ছিল। তবে ছোট খালুর বোন মিনুর সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠিত বর পাবার সম্ভাবনায় ছোট খালুর যৌথ পরিবারের সকলের দিক থেকেই এ ব্যাপারে মৌন সম্মতি ছিল। অবশ্য ছোট খালা এই সম্পর্ক কখনো চাননি। কিন্তু স্বামীর শক্তিশালী যৌথ পরিবারের বিরুদ্ধে তার কিছু করারও ছিল না। তাই তাকে বিষয়টা নিয়ে উচ্চবাচ্য করা থেকে বিরত থাকতে হয়। এই সুযোগে মিনুর সঙ্গে মামা বিশেষ ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুললেন। ছুটির দিনগুলো তিনি খালুর বাসাতেই কাটাতেন। বন্ধ ঘরে মিনুকে প্রেমের পাঠ দিতেন। আমি তখন বেশ ছোট। স্কুলের শেষ ক্লাসে পড়ি। তবে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে মামা আর মিনুকে নিয়ে যে গুঞ্জন চলতো তা বেশ বুঝতে পারতাম।

যাহোক, মামা ফ্লাইং ক্লাবে ট্রেনিং শেষ করে ইনডিয়ান এয়ারে পাইলট হিসেবে নিয়োগ পেয়ে গেলেন। কিন্তু এরপরই মামার আচরণে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। তিনি মিনুকে এড়িয়ে চলতে লাগলেন এবং খালুর বাসায় যাতায়াত বন্ধ করে দিলেন। এদিকে পরিস্থিতি আচ করতে পেরে মিনু নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিলেন। উপায় না দেখে খালুর পরিবার থেকে মামার পরিবারের কাছে বিয়ের বিষয়ে পরামর্শের প্রস্তাব পাঠানো হলো। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে মামা বিয়ের ব্যাপারে আলোচনা করতে অস্বীকার করলেন। সমঝোতার জন্য বয়স্ক আত্মীয়স্বজনরা অনেক চেষ্টা করলেন।

মিনু লজ্জার মাথা খেয়ে সকলের সামনেই প্রশ্ন তুললেন, বিয়েই যদি না করবে তাহলে আমাকে নষ্ট করলো কেন?

কিন্তু মামা মিনুর সঙ্গের চার বছরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে শুধুই বন্ধুত্ব বলে এড়িয়ে গেলেন। এবং বিয়ের জন্য বিভিন্ন স্থানে ফ্রেশ মেয়ে সন্ধান করতে থাকলেন।

তবে মিনুখালার ভাইয়েরাও কম যায় না। কোথাও বিয়ের কথা পাকাপাকি হলেই তারা সেখানে গিয়ে মামার আগের সম্পর্কের কথা জানিয়ে আসতেন। ফলে মামা সুপাত্র হওয়া সত্ত্বেও বিয়ে করতে পারছিলেন না।

অবশেষে বছর দুয়েক পরে শহরের পুরনো অঞ্চলে একটা মেয়েকে পছন্দ হলো। অত্যন্ত গোপনীয়তার মধ্যে তাড়াহুড়ো করে বিয়ে হয়ে গেল। মিনুখালার ভাইদের রোষ থেকে বাচতে মামা মূল শহর থেকে দূরে উপশহরে

বাসা নিলেন। সেখানে আত্মীয়স্বজন থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে ফ্রেশ স্ত্রী নিয়ে সুখী জীবন যাপন করতে লাগলেন।

মামা ইতিমধ্যে সন্তানের জনক হয়েছেন। চাকরিতেও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। এখন তিনি আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের ক্যাপটেন। প্লেন নিয়ে তিনি নানান দেশে যান। মাসের বেশির ভাগ দিনই দেশের বাইরে থাকতে হয়। মামি একা বোর (ঈমরণ) হতে থাকলেন। শেষে সময় কাটাতে সমাজ বিজ্ঞানে মাস্টার্স ডিগ্রিধারী মামি চেষ্টা করে একটা স্কুলে টিচার হিসেবে যোগ দিলেন। মাস ছয়েক স্কুলের কাজ আর সংসার সামাল দেয়ার ব্যস্ততায় বেশ কাটলো। এরপর তিনি আবার বোর হতে শুরু করলেন। কেমন যেন এক একাকীত্ব তাকে গ্রাস করতে লাগলো। মামা দিনের পর দিন ফ্লাইট নিয়ে দেশের বাইরে থাকলেন। এবং মামি শূন্য গৃহ আগলাতে হতাশাগ্রস্ত হলেন। বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হলেন।

এমন একটা সময়ে আমি ডিগ্রি পাস করলাম। এবং এমবিএ করার জন্য একটা বেসরকারি ইন্সটিটিউটে ভর্তি হলাম। আমার ইন্সটিটিউট ছিল মামার বাসার কাছেই। শহরের বাইরে থাকতেন বলে মামার পরিবারের সঙ্গে আমাদের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল না। মামা একদিন আমাদের বাসায় ফোন করে বললেন, তুই আমার বাসার কাছেই ক্লাস করতে আসিস, অথচ একদিনও বাসায় বেড়াতে আসিস না। আগামী সপ্তাহে আমার ফ্লাইট নেই। তুই এর মধ্যে ক্লাস শেষে বেড়াতে আসিস।

পরদিন ক্লাস শেষে মামার বাসায় গেলাম।

মামি নানান রকমের নাশতা করালেন এবং শুধুই বললেন, তুই অনেক বড় হয়ে গেছিস।

মামা বললেন, ছেলেটা স্কুলে ভালো ফল করতে পারছে না। তার জন্য একজন টিউটর দরকার। আমি তো মাসের বেশির ভাগ সময়ই বিদেশে থাকি। বাইরের কোনো টিউটর রাখতে চাই না। তোর ইন্সটিটিউট তো আমার বাসার কাছেই। বিকেলে ক্লাস শেষে যেদিন সময় থাকবে, ছেলেটাকে দেড় দুই ঘণ্টা পড়িয়ে যাবি। যাবার সময় আমার গাড়ি তোকে পৌছে দিয়ে আসবে, আর ভাগ্নে হিসেবে আমার ওপর তোর একটা দাবি তো আছেই। মনে কর সেই দাবিতেই মাসে মাসে তোকে কিছু হাত খরচা দেবো।

মামার অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। আমার ক্লাস শেষে সপ্তাহে তিন চার দিন ক্লাস টু-তে পড়ুয়া মামাতো ভাই অর্ক-কে পড়াতে শুরু করলাম। পড়া শেষে বুয়ার সঙ্গে অর্ক নিচের মাঠে সাইকেল চালাতে যেতো আর মামি আমাকে চা-নাশতা দিতে দিতে গল্প করতেন।

কয়েকদিন বাদে অর্ক পড়া শেষ করে নিচে গেছে। আমি সোফায় বসে টিভি দেখছি। এমন সময় মামি ট্রে ভর্তি নাশতা এনে সামনের টেবিলে রেখে একেবারে আমার গা ঘেষে বসলেন।

আমি একটু সরে বসতে চাইলাম।

কিন্তু মামি আমাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে সরে যাওয়া থেকে নিরস্ত করলেন।

তার চুল আর দেহ থেকে মিষ্টি সুবাস এসে আমাকে আলোড়িত করে তুলতে লাগলো। মামি তার মরাল গ্রীবা ঈষৎ বাকা করে আমার দিকে তাকালেন। তার চোখে যেন মন কেমন করা দৃষ্টি। হঠাৎ মামি দুই হাত আর দেহ দিয়ে আমাকে একেবারে ঢেকে দিলেন।

মেয়েদের দেহ যে এতো নরম হতে পারে তা আমার জানা ছিল না। আমার ভেতরে যেন এক তীব্র রক্ত স্রোত বয়ে যেতে লাগলো। কিন্তু বাল্যকাল থেকেই আমি নৈতিক চরিত্র রক্ষার বিষয়ে বিশেষ সচেতন। মামির উষ্ণ আলিঙ্গনকে মধুময় মনে হলেও তা স্বাভাবিকভাবে নিতে পারলাম না। বললাম, একি করছেন? এতো পাপ। প্লিজ, আমাকে ছেড়ে দিন।

মামি গালে টোল তুলে হাসতে হাসতে তার মুখখানা আমার মুখের একেবারে কাছে এনে ঈষৎ ভেজা পাতলা ঠোট দুটো নেড়ে বললেন, বোকা কোথাকার। নরনারীর সম্পর্কে কোনো পাপ নেই রে। কেন? কলেজে সমাজ

বিজ্ঞানে পড়িসনি যে, মানুষের ক্রমবিবর্তনের প্রথম দিকে বিয়ে বলে কিছু ছিল না। নারী–পুরুষ একত্রে দল বেধে বাস করতো। শিকার করে যা পেতো তা ভাগ করে নিতো নিজেদের মধ্যে। আর দলের মধ্যে থেকে পছন্দ মতো যৌনসঙ্গী বেছে নিতো উপভোগের জন্য। এই মিলনে যে সন্তান জন্মাতো তা হতো দলের যৌথ সম্পত্তি। মামি থামলেন। তারপর আমার কানের লতিতে মৃদু একটা কামড় দিয়ে আমাকে শিহরিত করে বললেন, আসলে যখন সম্পত্তির মালিকানা ভাগাভাগি শুরু হলো তখন পুরুষরা নারীদেরও ভাগাভাগি করে নিল। বিয়ে নামের প্রতিষ্ঠান খাড়া করলো এবং নৈতিকতার নানান মানদণ্ড বেধে দিল। প্রকৃতপক্ষে তো এসব কিছু না। তাছাড়া রাধা–কৃষ্ণের ব্যাপারটা চিন্তা কর না। তারা তো মামি–ভাগ্নেই ছিলেন। নীতি কথা নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে তারা কি প্রেমের আনন্দ উপভোগ করতে পারতেন? কথা শেষ করে মামি আমার কানের লতিতে আরেকটা হালকা, অথচ দীর্ঘ কামড় দিলেন।

তথাকথিত নৈতিকতার মানদণ্ড কিভাবে তৈরি হয়েছে মামির কাছে তার যুতসই ব্যাখ্যা জানতে পেরে সেটা লালন করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হলো না। তাছাড়া ইতিমধ্যে মামির নরম স্পর্শ আর কোমল কামড়ে আমি কামনার্ত হয়ে পড়েছি। ফলে আমার দিক থেকে কোনো বাধা দেয়ার ক্ষমতা হারালাম।

মামি অভিজ্ঞ খেলোয়াড়। বাকি সব কিছু তিনিই করলেন।

কিন্তু বিষয়টা আমার জীবনে প্রথম। তাই অল্পেই মুখ থুবড়ে পড়লাম। লজ্জায় অন্যদিকে চেয়ে রইলাম। মামি ভরসা দিলেন। শান্ত করে নাশতা করালেন। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাকে জাগিয়ে দিলেন।

এভাবেই শুরু। মামা ফ্লাইটে গেলে সপ্তাহের সবদিনেই অর্ক–কে পড়াতে যাই। পড়ানো শেষে অর্ক সাইকেল চালাতে যায়। মামিকে বোরড লাইফ থেকে আমি উদ্ধার করে সুখের সাগরে ভাসাই।

মামি এখন আনন্দময় জীবনের সন্ধান পেয়েছেন। পারিবারিক নানান অনুষ্ঠানে মামির উপস্থিতি এখন অনেক সরব। সেই বোরড হয়ে যাওয়া যুবতীর ইমেজ আর নেই।

মামির এই হঠাৎ উচ্ছল হয়ে ওঠাটা অনেকেরই নজর এড়ায়নি। এমনকি মামারও না। অনেক মেয়ের সঙ্গেই মামার সম্পর্ক ছিল। তাই ফ্রেশ মেয়ে মামির পরিবর্তনটা খুব সহজেই বোধহয় ধরে ফেললেন। তা টের পেলাম কয়েকদিন বাদেই।

সেদিন মামা দুই সপ্তাহের জন্য ফ্লাইট নিয়ে ইওরোপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। মামি আমাকে ফোনে খবরটা দিয়ে তাড়াতাড়ি বাসায় যেতে বললেন।

আসলে মামি কিছুদিন ধরে বড্ড ক্রেজি হয়ে উঠছিলেন। আর আমার বয়স তো কম। সুযোগ পেয়ে আমি নীতি বিসর্জন দিয়ে লোলুপ হয়ে উঠেছিলাম।

বিকেলের আগেই মামার বাসায় পৌছে গেলাম। অর্ক ঘুমোচ্ছিল। আষাঢ় মাস। আকাশ ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে বৃষ্টি নেমে এলো। খানিক বাদে বিদ্যুৎ চলে গেল।

মামির আজ কি যে হয়েছে, সম্পূর্ণ নিরাবরণ হয়ে নিজেকে আমার সামনে মেলে দিলেন।

আমি দেরি না করে তাকে লুফে নিলাম।

কতোক্ষণ গত হয়েছে জানি না। হঠাৎ ঘরের মধ্যে মামার চিৎকার শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমাদের গভীর আনন্দময় ব্যস্ততার সুযোগে ডুপলিকেট চাবি দিয়ে দরজা খুলে মামা কখন নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করেছেন তা টের পাইনি। মামার হাতে লাইসেন্স করা কালো কুচকুচে জার্মান পিস্তল। রাগ, অপমানে তিনি থর থর করে কাপছেন। আমি মামির বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে লাফিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়লাম। ব্যভিচারে রত অবস্থায় স্বামীর হাতে ধরা পড়ে হতচকিত মামি নগ্ন অবস্থাতেই বিছানার উপরে দাড়িয়ে পড়লেন।

সহসা চমকে উঠলাম পিস্তলের গর্জন শুনে। মামির বুকে গুলি লেগেছে আর সেখান থেকে লাল রক্তের ধারা ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসছে।

রক্ত দেখেই বাস্তবে ফিরে এলাম। দৌড়ে ঘর থেকে পালিয়ে গেলাম।

বাইরে বেরিয়ে চিন্তা করে দেখলাম আমার আর বাড়ি না ফেরাই ভালো। বহু চেষ্টায় তৈরি করা আমার ভদ্র ইমেজ আজ ভেঙে পড়লো। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবী কি যাচ্ছেতাই সমালোচনাই না করবে! তাছাড়া আদালতে মাই লর্ডের সামনে উকিলমশাইরা আমার অসৎ চরিত্রের নানানমুখী উন্মোচন করে আমার আর মৃত মামির সম্বন্ধে জঘন্য ধরনের যুক্তি-তর্কের অবতারণাও কম করবেন না। সেই সঙ্গে বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতে মামিকে জড়িয়ে আমার সম্বন্ধে যা রসালো বিষয়ের অবতারণা করা হবে তা ভাবতেই আমার রক্ত হিম হয়ে এলো। এসব কিছু থেকে রেহাই পেতে অজ্ঞাত স্থানে পালিয়ে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হলো। তাছাড়া লাইসেন্সপ্রাপ্ত পিস্তলধারী মামার রোষ কোনদিকে গড়ায় কে জানে?

হাওড়া স্ট্রেশনে গিয়ে আসামগামী ট্রেন পেয়ে তাতেই চড়ে বসলাম।

আসামের নানান জায়গা ঘুরে কোথাও শান্তি পেলাম না। সর্বদা একটা পাপবোধ আমাকে কুরে কুরে খেতে লাগলো। সারাক্ষণ মামির কথা মনে হতো। আমি বুঝতে পারলাম, মামির অপূর্ব সুন্দর দেহটাকেই শুধু নয়, তার মনটাকেও আমি ভালোবেসেছিলাম। এ অঞ্চলের পাহাড়ের নানান পীঠস্থান ঘুরতে ঘুরতে নীলাচলের এই কামাক্ষা মন্দিরে এলাম। সীতার অঙ্গ স্পর্শ মাত্র মনে হলো দেবী আমার সব পাপ চুষে নিলেন। আমার মন শান্ত হলো। সেই থেকে গত এক যুগ ধরে এই সীতা দেবীর মন্দিরেই আছি।

নিজের ভাগ্য বিপর্যয়ের করুণ কাহিনী শুনে সাধুবাবা বিষণ্ন বদনে গাজার কলকিতে ঘন ঘন টান দিতে লাগলেন।

তাকে আর বিরক্ত না করে কলকাতা যাবার জন্য বাসস্ট্যান্ডের দিকে পা বাড়ালাম।

বরিশাল থেকে

সম্বোধন

যারা ট্যারা তাদেরকে মানুষ সাধারণত নাম ধরে ডাকার চেয়ে *ট্যারা, কানা* ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করে থাকে। *প্রেমপাগল* শিরোনামে একজন বন্ধু কানা বা ট্যারা হওয়ার কারণে বন্ধুকে কানা বক ডাকা হয়। আমার প্রশ্ন, বন্ধুরা, আপনারা কখনো লক্ষ্য করেছেন, যে বন্ধুটিকে কানা বক বললে সে সহ্য করে কিন্তু তার আড়ালে সে কতোটুকু কষ্ট পায়?

অনেকে ট্যারা, কানা বললে সহ্য করলেও আমি তাদের দলে নেই। আমি ট্যারা, আমাকে কেউ ট্যারা বললে আমি বলি, সৃষ্টিকর্তা আমাকে এভাবে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আপনি, আপনারা কি পারবেন একটা ট্যারা বা কানা মানুষ বানাতে? আমিও তো মানুষ, আল্লাহ আমাকে তার ইচ্ছায় ট্যারা করেছেন। তা নিয়ে আপনি, আপনারা ব্যঙ্গ করার কে?

ট্যারা বা কানা মানুষেরও মন থাকে। সে মনটি ট্যারা বা কানা নয়। তাই ট্যারাদেরও ভালোবাসার বাসনা থাকাটা স্বাভাবিক। আসলে যারা প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে ট্যারা বা কানা তাদের মনের মধ্যে সব সময় একটি সংকোচ বোধ থাকে। এই সংকোচ এক সময় তীব্র লজ্জা বা রাগে পরিণত হয় যখন কোনো বড় অনুষ্ঠান কিংবা বিশেষ স্থানে তাকে কানা অথবা ট্যারা বলা হয়।

সবার কাছে একটা অনুরোধ, আপনারা কানা, ট্যারা মানুষকে কখনো কানা বা ট্যারা সম্বোধন করবেন না। আমি জানি, মুখে এর প্রতিবাদ না করলেও মনে তখন ভীষণ কষ্ট লাগে। মাঝে মধ্যে সৃষ্টিকর্তার ওপর রাগ হয়। কি এমন হতো কিছু মানুষকে ট্যারা বা কানা না বানিয়ে পূর্ণভাবে পৃথিবীতে পাঠালে! তবু আল্লাহর ইচ্ছার ওপর তো কারো হাত নেই। সে যা করে ভালো, মঙ্গলের জন্য করে।

অবশেষে সেন্ট ভ্যালেনটাইনস ডে উপলক্ষে সকল ধরনের মানুষের প্রতি রইলো অনেক সহানুভূতি এবং অনেক অ-নে-ক ভালোবাসা। মানুষ সবাই মানুষ, মানুষকে ভালোবাসতে শেখো - হোক সে ট্যারা, কানা, অন্ধ, পঙ্গু অথবা যে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধী।

নাম ঠিকানাবিহীন
রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম থেকে

অন্য ইতিহাস

ভালোবাসা বিষয়ক লেখা আহ্বানের পর পাঠকরা নানান ধরনের লেখা পাঠিয়ে থাকেন। এখানে যে চিঠিটি প্রকাশিত হলো সেটি পাঠিয়েছেন একজন প্রেমিক। তিনি তার প্রেমিকার একটি ব্যক্তিগত চিঠি পাঠিয়ে লেখাটি ছাপাতে অনুরোধ জানিয়েছেন এই কারণে যে, মেয়েরা নানানভাবেই প্রতারণার শিকার হচ্ছে। এসব প্রতারকদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরাও আছেন। তিনি জানাতে চেয়েছেন, এই চিঠিটি প্রকাশ করা হলে আরো অনেক মেয়েকে সতর্ক করা সম্ভব হবে। আমরা চিঠিটির মূল বিষয়বস্তু ঠিক রেখে নাম, ঠিকানা বা স্থান সব উহ্য রেখে লেখাটি প্রকাশ করলাম। ছোটখাটো ভুলও যে কতো বড় বিপদ নিয়ে আসে তা এই চিঠিতে ফুটে উঠেছে। ***- যাযাদি***

প্রিয়,

এটি হয়তো তোমাকে দেয়া আমার শেষ চিঠি। কারণ তুমি আমার পূর্ব ইতিহাস জানতে চেয়েছো যার বেশির ভাগই আমি তোমাকে বলার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কিছু অংশ বাকি রয়ে গিয়েছে যা জানার পর থেকে তুমি আমাকে শুধু ঘৃণা করবে। এক মুহূর্তের মধ্যেই আমাকে ছুড়ে ফেলে দেবে রাস্তায়। যেহেতু আমি তোমাকে আমার চেয়েও বেশি ভালোবাসি, তাই আমার সব কিছু তোমার জানা দরকার সেটা যতো ঘৃণ্য বিষয়ই হোক না কেন। তবে *আমার ইতিহাস লিখতে পাচ পাতারও প্রয়োজন হবে না* - তোমার এই কথাটা আমি রাখতে পারলাম না। কিন্তু চিঠি যতোটুকু সম্ভব বড় করার চেষ্টা করবো।

তুমি শুনে খুব অবাক হবে যে, আমার জীবনে শিক্ষক নামের সম্মানিত ব্যক্তিগুলো এতো কষ্ট দিয়েছে এবং এমন কিছু শিক্ষা দিয়ে গেছে আমাকে যা অশিক্ষা ছাড়া আর কিছু নয়। আমি তোমাকে আমাদের স্কুলের স্যারের কথা বলেছি। ঠিক তারই মতো আরেকজন স্যার আমাকে একইভাবে অশিক্ষা দিয়েছেন। তিনি আমার স্কুলের কোনো স্যার নন। আমি এখন যার কাছে প্রাইভেট পড়ি তার আগের স্যার। এসএসসি পরীক্ষার আগে যার কাছে আমি পড়তাম তার কথাই তোমাকে বলছি।

আসলে স্যারকে এতোটাই আপন ভাবতাম, যে কথা আম্মুকে বলতে পারি না সে কথা স্যারকেও বলতাম। তাই একদিন কথায় কথায় স্যারকে স্কুলের স্যারের ঘটনাটা বলেছিলাম। এও বলেছিলাম, স্যারের হাত থেকে বাচার জন্য কি করা যায়। তখন ওই স্যার আমাকে ঠিক সেই উপায়গুলো বললেন যা তুমিও আমাকে বলেছো। কিন্তু তার নিজের কাছ থেকে এমন আচরণ আমি কখনো আশা করিনি। এর পরদিন থেকে দেখি তিনি বিভিন্নভাবে আমার কাছ থেকে সুযোগ নিতে চান। তিনি বিবাহিত এবং সন্তানের বাবা। তাই তার কাছ থেকে এমন ব্যবহার আমি কখনোই কল্পনাও করিনি।

স্যার ধীরে ধীরে আমার প্রতি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। এমন সময়ও গিয়েছে যখন তিনি তার গুরুত্বপূর্ণ কাজ ফেলে আমাকে সময় দিতেন। এমনকি আমি হয়তো তোমাকে বলেছি, সকাল আটটায় এসে ঠিক রাত বারোটায় গিয়েছেন এমনো হয়েছে।

ভাবছো, মানুষ কিভাবে এতোগুলো ঘণ্টা একজন ছাত্রীকে পড়ায়? পড়ানোর পাশাপাশি তিনি আমার সঙ্গে ঠিক স্কুলের সেই স্যারের মতোই জঘন্য কাজগুলো করেছেন। বরং তারচেয়েও বেশি কিছু।

তুমি আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলে, আমাকে আগে কেউ কখনো ঠোট স্পর্শ করেছে কি না? আমি তোমাকে সেদিন মিথ্যা বলেছিলাম। ওই স্যারই প্রথম আমার সঙ্গে এমন করেছেন। আমার সর্বাঙ্গেই তার হাত প্রবেশ করেছে। ভাবছো, বাসায় বসে এসব কিভাবে করে? তিনি এমনভাবে সুযোগ নিতেন যা আমিই কল্পনা করতেও পারতাম না।

তাকে আমি অনেকবার মানা করেছি। অনেকবার প্রত্যাখ্যান করেছি। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি।

প্রায়ই বলতেন, তিনি আমাকে ভীষণভাবে ভালোবেসে ফেলেছেন। সে জন্য আমার কাছে সব ঘটনাই খুলে বলতেন। এমনো নাকি হয়েছে, আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে তার বিছানা ভিজে গেছে। আবার অফিসে নাইট ডিউটি করার মুহূর্তে হয়তো আমার কথা চিন্তা করে অনেক খারাপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন।

আমি তোমাকে এতো বেশি ভালোবাসি যে, তোমার কাছ থেকে লুকাতে গিয়েও লুকাতে পারলাম না। আমি জানি, এই চিঠি পড়ার পর তুমি আমাকে ধিক্কার দেবে, রীতিমতো ঘৃণা করবে। কিন্তু সব কিছুর জন্য আমি প্রস্তুত।

তুমি হয়তো আমাকে বিশ্বাস করছো না। কিন্তু যা লিখেছি তা পুরোপুরি সত্য। এই ঘটনা আমি সর্বপ্রথম তোমাকেই বললাম। ওই স্যার আমাকে এও বলেছিলেন, আমার জীবনে যে এতো কিছু হয়ে গেছে তা যেন কোনোদিনও কোনো ছেলেকে না বলি। তাহলে কোনো ভালো ছেলে আমাকে পছন্দ করবে না। আমার কখনো ভালো জায়গায় বিয়ে হবে না।

কিন্তু এখন এমন এক পর্যায়ে এসে পৌছেছি যে, তোমাকে আমি আমার সব কথা খুলে বলবো। তোমাকে আমি মিথ্যা বলবো না। তাকে আমার একটু হলেও ভালো লেগেছিল। কোনদিক দিয়ে জানি না। এতোটুকু পড়ার পরই হয়তো তুমি চিন্তা করছো, তুমি বিরাট ভুল করেছো। তুমি এমন এক মেয়েকে ভালোবেসেছো যে তোমার আগে অন্য একজনকে তার অনেকাংশই দিয়ে দিয়েছে।

সত্যিই তুমি খুব বড় একটা ভুল করেছো। তুমি হয়তো এখনই খোজ নেয়া শুরু করবে যে, আগে আমি কার কাছে পড়তাম। কিন্তু আমার ভালোবাসার দোহাই দিয়ে বলছি, তুমি এমন কাজ করো না। তাহলে আমি পুরোপুরি শেষ হয়ে যাবো। অবশ্য অন্য কোনো ভালো মেয়ে হলে এতো দিনে আত্মহত্যা করে মারা যেতো। আমারও মাঝে মধ্যে সে রকম ইচ্ছা হতো। ঠিক সেই মুহূর্তে তুমি আমার জীবনে এসেছো। আমি ওই স্যারকে তোমার কথাও বলেছি। স্যার আমাকে নিষেধ করেছিলেন, এসবে না জড়াতে। কিন্তু আমি মনের অজান্তে তোমাকে ভীষণভাবে চেয়েছি। তাই আমাকে ভুল বুঝো না। আমি জীবনে এমন কিছু জঘন্য কাজ করেছি যা একজন পতিতা নারীর পক্ষেই করা সম্ভব। তবে তার সঙ্গে আমার বিশেষ কিছু হয়নি যা তুমি ভাবছো।

তিনি আমাকে মোটামুটি সেক্স সংক্রান্ত সব কিছুই বলেছিলেন। কিন্তু সে রকম কিছু করেননি, এ ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত থাকো। তোমার জন্য আমার খুব কষ্ট হয়। কারণ আমি তোমার যোগ্য নই। তোমার বৌ হওয়ার তো অবশ্যই নই। এমনকি তোমার বাসার কাজের মেয়ে হওয়ারই যোগ্যতা আমার নেই। আমি হয়তো তোমার কাছে আজ এই মুহূর্ত থেকে ডাস্টবিনের আবর্জনার চেয়েও জঘন্য কিছু।

কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি কখনোই এমন হতে চাইনি। এই নিষ্ঠুর শিক্ষকগুলো কেন আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করলো? তারা বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও কেন আমার দিকে নোংরা হাত বাড়িয়ে দিল আমি জানি না। আমি সব কিছু ভুলে গিয়ে শুধু তোমাকে ভালোবেসেছি। তবে তুমি আমাকে এমন পর্যায়ে দাড় করিয়েছো যে, আমার সম্পর্কে তোমার সব কিছুই জানা দরকার।

আমি তোমাকে এখন শুধু এটুকুই বলবো, আমাকে ভুলে যাও। আমার মতো ঘৃণ্য চরিত্রের মেয়েদের তোমার মতো ছেলের জীবনে কোনো স্থান থাকতে পারে না। আমার প্রতি কোনো দয়া করো না। আজ এই মুহূর্ত থেকে তুমি আমাকে তোমার মন, প্রাণ, শরীর সব কিছু থেকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দাও। তাতেই আমি শান্তি পাবো। আমার খুব এবং খুবই কষ্ট হয় তোমার জন্য যখন ভাবি, তোমার জীবন আমি নষ্ট করেছি।

কিন্তু আর না। এখন তো সত্য জেনেছো। তোমার যদি অন্য কোনো মেয়েকে ভালো লাগে তাহলে তাকে নিয়েই চিন্তা-ভাবনা শুরু করো। কিন্তু অবশ্যই তার স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে ধারণা নেবে। কারণ নারী সত্ত্বার মূল্য কেবল চরিত্র দিয়েই প্রকাশিত হয়। আমার চরিত্রে কলংকের দাগ লেগে গেছে অনেক আগেই যা তোমার চোখে পড়েনি। আমার মতো নষ্টা, চরিত্রহীনা মেয়েদের জন্যও অনেক পুরুষ আছে। তোমার মতো ছেলেদের জন্য অনেক ভালো মেয়েই আছে এ জীবনে। তাদের মধ্যে একজনকে তোমার বাছাই করে নেয়া উচিত। তুমি আমাকে ফোনের কথা গতকাল বলেছো। তুমি হয়তো জানো না, আমি স্কুল জীবনে অস্বাভাবিক রকমের দুষ্ট ছিলাম। তাই এলাকার খুব কম বাসাই আছে যেখানে আমি ফোন না করে উল্টা-পাল্টা কথা বলিনি।

আমার দৃষ্টিতে যতোটুকু মনে পড়ে, আমি দুষ্টুমি করেই এসব করেছিলাম। কিন্তু এখন বুঝি কি খারাপ আর জঘন্য কাজ করেছিলাম টেলিফোনের মানুষগুলোর সঙ্গে। আমার সম্পর্কে বোধহয় তোমার আর কিছু জানার ইচ্ছা নেই। আমার ইতিহাসের এখানেই সমাপ্তি।

তবে একটা সত্যি কথা, আমি তোমাকে আমার জীবনে সত্যিকারভাবেই ভালোবেসেছি। এতে কোনো ঘাটতি, অপূর্ণতা ছিল না। এতো বেশি ভালোবেসেছি বলেই তোমাকে আমার এতো কিছু বলা। কিন্তু এতোক্ষণে তুমি আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছো তা বুঝতে পারছি। আম্মু এখনো পর্যন্ত জানেন না, রবিবার ক্লাস হবে, নাকি হবে না। যদি না-ই জানতে পারেন তাহলে তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করবো। অবশ্য তুমি এতো কিছু শোনার পর আসবে কি না জানি না। আজ ফোন করবে না। করলেও আমি কল ব্যাক করবো না।

আমি শুধু তোমাকেই ভালোবাসি, ভালোবাসি এবং শুধুই ভালোবাসি।

এটাই চিরন্তন সত্য।

ইতি-

অপ্রিয়া

সত্য

ভালোবাসার প্রকৃত অর্থ কি? তা আজও আমার জানা হয়নি। তবে ভালোবাসার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। আমি ভালোবাসাকে চিনি। কারণ, আমিও যে ভালোবেসেছি! এ ভালোবাসা কিছুটা অন্য রকম। অন্য রকম বলছি এ জন্যই যে, অন্য সবার জীবনে ভালোবাসা যেভাবে আসে, আমার জীবনে ঠিক সেভাবে আসেনি, এসেছে আলাদাভাবে।

ওমর যখন আমার হৃদয়ে ভালোবাসার বীজ বুনতে চাইলো তখন তার ইচ্ছা অনুযায়ী সাড়া দিতে পারিনি। তাই ওখানেই দাড়িয়ে রইলো আমার ভালোবাসা।

এরই মাঝে কেটে গেল অনেকটা সময়। সে সময়টাতে কে কার কতোটা খোজখবর নিয়েছি তা নিয়ে আজ আর তর্কে যাবো না। আবারও আমাদের দেখা হলো কথা হলো। ওমর তার জীবনের ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনা আমার কাছে গোপন করেছিল।

কিছু না জেনেই ছুটলাম ভালোবাসার পেছনে। তারপর আর পিছু ফিরে তাকাইনি। ধীরে ধীরে ওর সম্পর্কে সবই জেনেছি। এরপরও ফিরে আসতে পারিনি। কারণ, আমার স্বচ্ছ, শাদা, পবিত্র মনে ওমর খুব গভীরভাবে দাগ কেটেছিল।

অনেক কিছুর পরও আমরা বিয়ে করেছি। এমন বিয়ে কোনোদিন কোনো মেয়ের জীবনে হয়েছে কি না আমার জানা নেই। আমার কোন আত্মীয়স্বজন ছিল না সেদিন, আমি ছিলাম সম্পূর্ণ একা। কোন আনন্দ নেই, উল্লাস নেই। সেই থমথমে পরিবেশের মধ্যে আমাদের বিয়ে সম্পন্ন হলো। বিয়ের পর যে যার বাড়ি ফিরে এলাম।
সেদিনের অনুভূতি কাউকে বোঝানো যাবে না। এটাই সত্য যে, আজ আমরা স্বামী–স্ত্রী, কিন্তু কেউ জানে না। প্রায়ই আমাদের দেখা হয়, কিছু কথা হয়। তারপর আবার আমি আমার জায়গায়, ওমর তার জায়গায়।
আমি আজও জানি না ও আমাকে কতোটুকু ভালোবাসে। মাঝে মধ্যে মনে হয়, ওমর যখন দেশের বাইরে ছিল তখন ও আমাকে চিঠি লিখতো। সেই ওমর আর আজকের এই ওমরের মাঝে অনেক ব্যবধান।
ভাবতে ভালো লাগে আমি যার অপেক্ষায় ছিলাম সেই ওমর আজও ফিরে আসেনি। বিশ্বাস করি, মানুষের মন পরিবর্তনশীল। কিন্তু কেন যেন মন মানতে চায় না। ওর কষ্টগুলোকে অনুভব করতে পারি। তবে কষ্টগুলোকে ছুয়ে দেখতে পারি না। বোঝাতে পারি না ওকে কতোটা ভালোবাসি।
ওর কারণে কারো কথা চিন্তা না করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ওর ওপর যতোই রাগ আর অভিযোগ থাক না কেন, যখনই ওর ভুবন ভোলানো হাসি ও ঠোটে দেখি তখন আমার কোনো রাগ থাকে না। আমিই যেন ভেসে যাই ওর হাসির প্লাবনে। তবুও মাঝে মধ্যে মনের ভেতর একটা ভয় এসে উকি দেয়, ও যদি ওর বাবার মতো হয়! ও যদি আমার ভালোবাসাকে মূল্যায়ন করতে না পারে? সেদিন কোথায় গিয়ে দাড়াবো?
বেশ কয়েকদিন আগে হাসপাতালে একটা সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুকন্যা চোখ মেলে মা আর এই নিষ্ঠুর পৃথিবীটাকে এক নজর দেখেই চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে গেল শীতল ঘুমে মায়ের শত আর্তনাদ এবং কর্তব্যরত অনেক চিকিৎসকের বহু চেষ্টাতেও তার ঘুম ভাঙলো না।
আমি বলবো ওই মেয়েটা বড়ই ভাগ্যবতী। কোনো কঠিন বাস্তবতা কোনো স্বার্থপরতা, কোনো কষ্ট ওকে স্পর্শ করতে পারেনি। ছেলেদের রহস্যময় চরিত্রের সঙ্গে ওকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়নি।
আমরা যারা বেচে আছি প্রতিনিয়ত কতো কিছু সামনে এসে দাড়াচ্ছে কতো সংগ্রাম বেঁচে থাকার জন্য। তবুও পাওয়া যায় না প্রকৃত ভালোবাসার সন্ধান।
এ লেখা পড়ে হয়তো বা ছেলেরা আমার ওপর ক্ষেপে যাবে আর যারা নতুন প্রেমিক–প্রেমিকা আছেন তারাও হয়তো বা রাগ করবেন আমার ওপর। তারচেয়ে বরং আপনারাই আস্তে আস্তে উপলব্ধি করবেন, ভালোবাসাও বদলায়। পুরনো হয়, এক সময় তা ফুরিয়েও যায়। পৃথিবীতে আসলে কেউ কারো নয়। জীবনটা হচ্ছে সিনেমার শুটিং স্পট। এবং আমরা সবাই অভিনেতা। প্রয়োজন মতো সবাই সবার আপন, প্রয়োজন শেষে সবাই একা।
এটাও সত্য যে, সুখের ভাগ সবাইকে দেখা যায়, কিন্তু দুঃখের ভাগ কাউকেই দেয়া যায় না। দুঃখটা হচ্ছে একান্তই নিজের। মানুষের সঙ্গে আকাশের তুলনা করা যায়, রাতে আকাশের বুকে তারা দেখা যায়, চাদ দেখা যায়, সকালে আর দেখা যায় না। দিনে সূর্য দেখা যায়, রাতে দেখা যায় না। মানুষ আকাশের মতোই একা।
সব কিছুর পরও মানুষ বেচে থাকে, কাউকে ভালোবাসে, সুখ পায়, দুঃখ পায়। জীবনে সফলতা পায় আবার ব্যর্থ হয়। আবারও আশার কাজল চোখে একে সামনে এগিয়ে যায়, এটাই জীবন, এটাই বাস্তব এবং সত্য।

নাম ঠিকানা বিহীন